কুরআন থেকে নেওয়া জীবনের পাঠ

আরিফ আজাদ

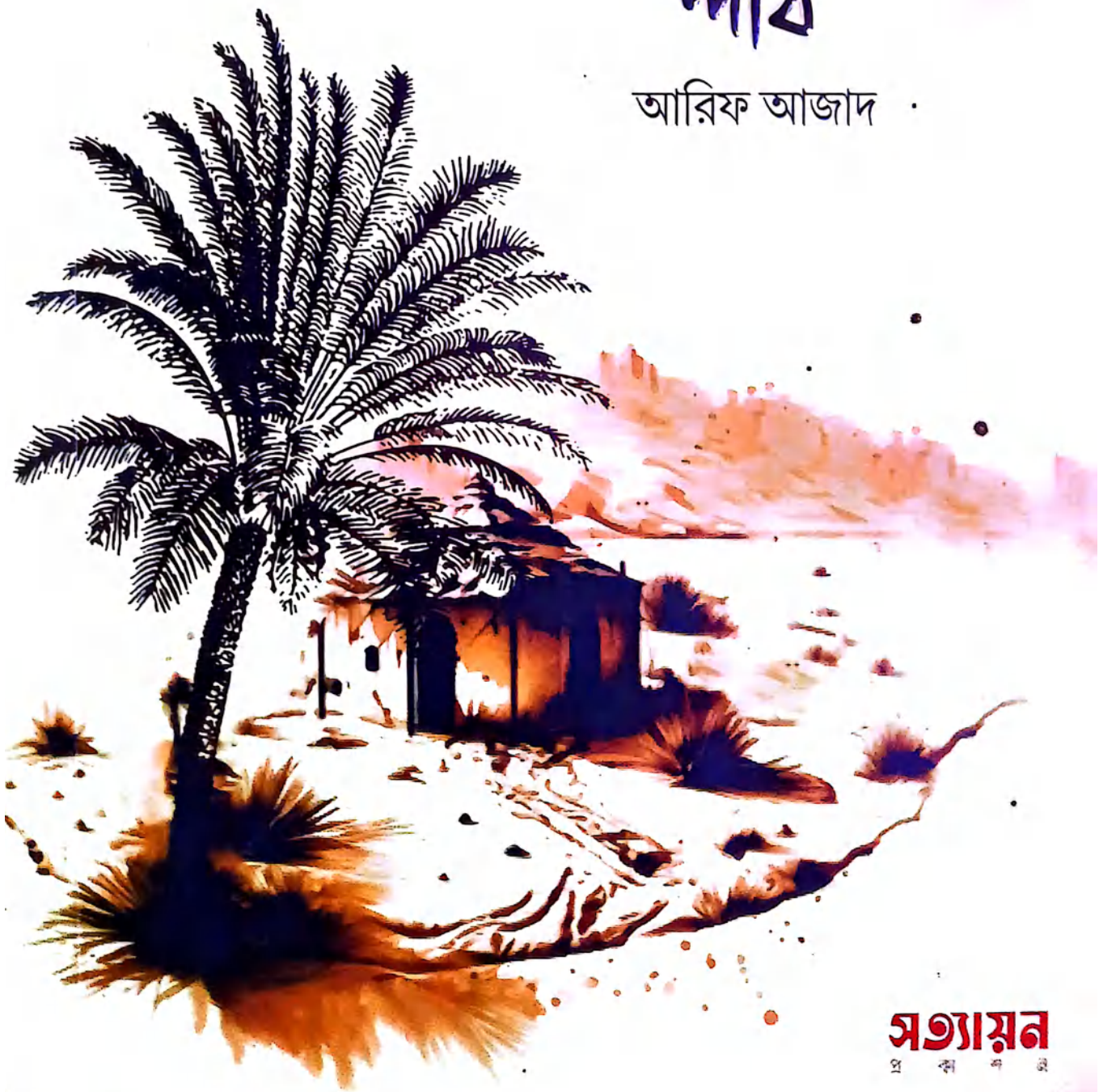

সত্যায়ন
প্রকাশন

সূচিপাতা

শুরুর আগে ০৭

যখন নেমে আসে আঁধারের রাত ১০

নীল দরিয়ার জলে ১৬

দুঃখের আলপনায় স্বস্তির রং ২১

ছুটে আসে আগুনের ফুলকি ২৫

ব্যাকুল হৃদয়ের আকুল সঙ্গীত ৩৪

যে আঁধারের রং নীল ৪০

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা, বিন্দু বিন্দু জল ৪২

আলো জ্বেলে যাই ৪৬

চাঁদে যারা জমি কিনছেন ৫০

আকাশের খাতায় লেখা লজ্জার নাম ৫৭

ঝরা পাতার কাব্য ৬১

অন্তর বাঁচানোর মন্তর ৬৩

এ-সময় শীঘ্রই ফুরিয়ে যাবে ৭১

অন্তরের ব্যাকরণ ৭৯

আল্লাহকে যারা পাইতে চায় ৮৭

প্রেমময় কথোপকথন ৯২

সোনার তোরণ পানে ৯৭
প্রবল প্রতাপশালী তবু মহীয়ান ১০৬
অন্তরে অন্তরে ১১২
ফিরআউন সিনড্রোম ১১৮
জীবনের বেলা শেষে ১২৬
উঁহু, একজন কথা রাখেন ১৩০
চালাও সে পথে যে পথে তোমার প্রিয়জন গেছে চলি ১৩৪
তোমার প্রতিবেশি করে নিয়ো ১৪৫
আলো অথবা অন্ধকার ১৪৯
নূহের প্লাবন এবং ভাবনার অলিগলি ১৫৪
সে মহান পরাজয়ে ১৬২
তারা কভু পথ ভুলে যায় না ১৭১
ভীষণ একলা দিনে ১৭৭

শুরুর আগে

সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিজগতের রবের; যিনি আমাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, যিনি দান করে চলেছেন অবারিত নিয়ামত তাঁর অফুরন্ত ভান্ডার থেকে। দরুদ এবং সালাম প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, আসমানি আলোয় যিনি আলোকিত করেছেন গোটা সৃষ্টিলোক। যিনি বহন করেছেন নূর এবং তাতে সমুজ্জ্বল হয়েছে অন্ধকারে ঢেকে থাকা হৃদয়গুলো।

আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে—রামাদান মাসের এক নিশ্চুপ নিশুতি রাতে হেরা গুহায় জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নিয়ে এসেছিলেন কুরআন। অন্ধকার প্রকোষ্ঠে সেই যে আলোর ফোয়ারা ছুটেছিলো, সেই ধারা একই গতি, একই তেজ আর শক্তিতে আজও বহমান। অন্ধকারে নিমজ্জিত একটা সভ্যতা পেলো ঐশী আলোর ছোঁয়া। গোটা মানবসভ্যতা পেলো একটা আসমানি জীবনবিধান। সেই জীবনবিধান সত্যের সারথী, আর সকল মিথ্যা আর অসত্যের প্রতি সেটা ছিলো এক অনন্ত লড়াইয়ের ইশতেহার।

কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, কুরআন যদি পাহাড়ের ওপর নাযিল হতো তাহলে পাহাড় ধসে পড়তো। এতোটাই তেজ আর শক্তি কুরআনের কথাগুলো ধারণ করে। কিন্তু কী আশ্চর্য ঘটনা দেখুন—সেই কুরআনকে মানুষের হৃদয় কতো অবলীলায় ধারণ করতে পারে! মহান রবের কী অপার অনুগ্রহ, সুবহানাল্লাহ!

কুরআন নাযিল হয়েছে জীবনবিধান হিশেবে। জীবনের সকল অনুষঙ্গ আর অনুঘটকের জন্য কুরআন পেশ করে এক অনুপম প্রস্তাব। কুরআন বাতলে দেয় অনন্তের পথ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে—যে কুরআন একদা ঘুরিয়ে দিয়েছিলো পৃথিবীর মোড়, যার সংস্পর্শ পেয়ে আমূল বদলে গিয়েছিলো ধ্বংসের

দ্বারপ্রান্তে থাকা একটা আস্ত সভ্যতা, সেই কুরআন আজ আমাদের বুকশেলফে কী নিদারুণ অবহেলা আর অযত্নে পড়ে থাকে! জীবনের পরতে পরতে আমাদের সাথি হবে—এই উদ্দেশ্যেই নাযিল হয়েছিলো কুরআন, কিন্তু আজ আমাদের জীবনে সাথির কোনো অভাব না হলেও, কুরআনকে দেওয়ার মতো সময়ের আমাদের বড্ড অভাব!

আমরা হয়তো কুরআন তিলাওয়াত করি, কিন্তু কখনো কি ভেবেছি যে—কী বার্তা এই কুরআন আমাদের দেয়? কেন নবি-রাসূল, সালিহীনদের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনাবলিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্থান করে দিয়েছেন কুরআনে? কুরআনের একটা অক্ষর, একটা যতিচিহ্নও অতিরিক্ত নয়। কুরআনে মজুদ থাকা প্রতিটা শব্দের পেছনে আছে রহস্য আর কার্যকারণ।

কিন্তু কুরআনে লুকিয়ে থাকা সেই মণি-মুক্তোগুলোর সন্ধান কীভাবে লাভ করবো আমরা? কীভাবে আহরণ করবো সেই জ্ঞান আর সেই নির্যাস, যা লুকিয়ে আছে প্রতিটি শব্দের ভাঁজে, প্রতিটি আয়াতের গভীরে? কুরআনকে জীবনের চোখ দিয়ে অধ্যয়ন করলেই কেবল এটা সম্ভব। যাপিত জীবনের অনুষঙ্গগুলোর সূত্র যখন আমরা কুরআনে খুঁজতে যাবো, ঠিক তখনই এক অনন্ত জ্ঞান-রাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হবে আমাদের সামনে।

কুরআন থেকে নেওয়া জীবনের পাঠ বইটি এরকম কিছু ভাবনারই সমষ্টি। আমার কুরআন অধ্যয়নের নোটখাতাও বলা যায় এটাকে। আমার সেই ভাবনাগুলো যদি কিছু মানুষকে অন্তত কুরআন নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে, যদি তারাও কুরআনের চোখ দিয়ে জীবনকে দেখার প্রয়াস পায়—সেই চিন্তা থেকে এই ভাবনাগুলোকে মলাটবদ্ধ করা।

এটা কোনো তাফসীরের বই নয়, আর আমি নিজেও নই কোনো আলিম। আমি নিতান্তই সাধারণ একজন মানুষ, যে কুরআন নিয়ে ভাবতে ভালোবাসে। কুরআনের অলংকার, ভাষা-ছন্দ, গভীরতা আর প্রখরতার মাঝে ডুবে থাকবার যার দুর্নিবার নেশা। কিন্তু এই বইয়ের ভাবনাগুলো আদতে প্রসিদ্ধ তাফসীরগুলোর সারনির্যাস। আমাদের পূর্বসূরীদের বলে যাওয়া, রেখে যাওয়া আর লিখে যাওয়া গ্রন্থগুলোই এখানে মূল উৎস হিশেবে সামনে রাখা হয়েছে। বইতে মজুদ থাকা অনেক ভাবনা আমি বিভিন্ন আলিম আর উস্তাযগণের

লেকচারে শুনেছি, আর্টিকেলে পড়েছি। সেগুলো নোট করেছি এবং কুরআন অধ্যয়নের সময় সেই নোটগুলোকে সামনে রেখেছি। বিশেষকরে শাইখ আব্দুল নাসীর জাংদা হাফিজাহুল্লাহ, উস্তাযা আইদা মাসুরি মোস্তফা, কুরআন-তাফসীর নিয়ে তৈরি Tulayhah Blog সহ নানান উৎস। আমি তাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন তাদেরকে উত্তম বিনিময় দেন।

বইটা বিদগ্ধ আলিম দ্বারা সম্পাদনা করা হয়েছে বারংবার। রেফারেন্সগুলোও ক্রস চেকের মাধ্যমে নিরীক্ষণ করা হয়েছে। তবে মানুষ মাত্রই তো ভুল করে। মানবীয় দুর্বলতার কারণে এই বইতেও ভুল থেকে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। বইটার কোনো ভুল যদি সহৃদয় কোনো পাঠকের নজরে পড়ে, খুব আপ্লুত হবো যদি তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণী দেন। নিশ্চয় এই বইতে যা-কিছু ভালো, তা কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে, আর যা-কিছু ভুল তার দায় শুধুই আমার।

পাঠকের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ—এই বই যদি আপনার বিন্দুমাত্রও উপকার করে তাহলে আমার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দুআ করতে ভুলবেন না। আর হ্যাঁ, যদি মনে করেন বইটা আপনার কোনো ভাই-বন্ধু-আত্মীয় বা শুভাকাঙ্ক্ষীর জীবনেও পরিবর্তন আনতে সহায়ক হতে পারে, তাহলে বইটা পড়া শেষে তার কাছেও পৌঁছে দেবেন।

আমাদের হৃদয়জুড়ে নামুক কুরআন বসন্ত।

ওয়া মা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

আরিফ আজাদ
arifazad.bd@outlook.com

যখন নেমে আসে আঁধারের রাত

বেকার, অসচ্ছল এবং আর্থিকভাবে নিদারুণ কষ্টে আছে এমন বহু মানুষকেই আমি চিনি, যারা একটা মানসিক অস্থিরতার ভেতর দিয়ে দিন গুজরান করছে। সাধারণত বিপদ-আপদ, দুঃখ-দুর্দশা যখন আমাদের স্পর্শ করে, আমরা তখন খুব বিপন্ন হয়ে পড়ি এবং নিপতিত হই হতাশার ঘন গভীর অন্ধকারে। এমন কঠিন সময়ে আমাদের অন্তর কীভাবে যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে বিস্মৃত হয়ে পড়ে। আমাদের ওপরে নিপতিত দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে দুনিয়ার সম্ভাব্য সকল উপায় তখন মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিলেও, যিনি সকল সমস্যার সমাধানকারী—তাঁর দ্বারস্থ হওয়ার কথা আমরা যেন বেমালুম ভুলে যাই।

আমিসহ এমন অনেক মানুষই চারপাশে আছে, যারা জীবনের কঠিন সময়গুলোতে বেশ অগোছালো হয়ে পড়ে। দুঃখ আর দুর্দশার এমন কঠিন সময়গুলোতে সুন্নাহ আর নফল তো দূরে থাকুক, ফরয আদায় করতেই কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠি আমরা। আমাদের তখন সালাতে মন বসে না, যিকির-আযকারে মন বসে না, কুরআন তিলাওয়াতে মন বসে না। জীবন তখন আমাদের কাছে হিমালয় ডিঙানোর মতোই দুষ্কর ঠেকে।

কিন্তু এমনটা কি আদৌ হওয়ার কথা ছিলো?

মূসা আলাইহিস সালামের জীবনের একটা ঘটনা আমাকে বেশ ভাবনার মধ্যে ফেলে দেয়। দুঃখ আর দুর্দশার দিনে মূসা আলাইহিস সালামের অন্তরের দৃঢ়তা আর চিন্তার প্রখরতা আমাকে এমনভাবে নাড়া দেয় যে—আমার জীবনের দর্শনটাই উল্টেপাল্টে যায়।

যুবক অবস্থায় একবার এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার মুখোমুখি হয়ে মূসা আলাইহিস সালামকে নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে মাদইয়ান নামক একটা জায়গায় পালিয়ে আসতে হয়। মাদইয়ানে মূসা আলাইহিস সালামের আসার ঠিক পরের একটা

ঘটনা কুরআন বেশ গুরুত্ব সহকারে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। সেই ঘটনায় দেখা যায়—দুজন নারী তাদের বকরিকে পানি পান করাতে এসে একটা কূপের অদূরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দাঁড়িয়ে থাকবার কারণ হচ্ছে—ওই সময়টায় কূপে কিছু পুরুষ মানুষ তাদের নিজ নিজ বকরিকে পানি পান করাচ্ছিলো। যেহেতু কূপের কাছে যারা আছে তারা সকলেই পুরুষ, তাই নারীদ্বয় ওই মুহূর্তে কূপের নিকটে না গিয়ে, অদূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করাটাকেই নিজেদের জন্য সমীচীন মনে করলো। পুরুষেরা তাদের কাজ সেরে চলে গেলে তারা কূপের নিকটে যাবে এবং বকরিকে পানি পান করাবে—এমনটাই তাদের পরিকল্পনা।

মাদইয়ানে মূসা আলাইহিস সালাম তখন সদ্য পা রেখেছেন। এবং ঘটনাক্রমে ওই কূপের কাছেই একটা গাছের নিচে বসে ছিলেন তিনি। কূপে পুরুষদের আনাগোনা এবং অদূরে দুজন নারীর দাঁড়িয়ে থাকা এবং কূপের কাছে তাদের ঘেঁষতে না পারার বিষয়টা নজর কাড়লো মূসা আলাইহিস সালামের।

মেয়ে দুটো যেহেতু নিজেদের বকরিকে পানি পান করাতে পারছে না, তাই মূসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেলেন। তিনি স্বেচ্ছায় তাদের বকরিগুলোকে কূপ থেকে পানি পান করিয়ে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিলেন এবং যে গাছটির নিচে বসা ছিলেন আগে, পুনরায় সেই গাছের নিচে এসে বসে পড়লেন।

গাছের নিচে ফিরে এসে তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে একটা দুআ করেছিলেন সেদিন। সেই দুআটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এতো পছন্দ করলেন যে, সেটাকে তিনি গোটা মানবজাতির জন্য কুরআনে স্থান করে দিয়েছেন। কিয়ামত-কাল অবধি সেই দুআ আমরা পাঠ করবো—সালাতে, নিজেদের বিপদে-আপদে, নিজেদের সুখ আর দুঃখের দিনে।

গাছের নিচে ফিরে এসে মূসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন:

> رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾
>
> "আমার রব! আমার প্রতি যে অনুগ্রহই আপনি দান করবেন, আমি তার-ই মুখাপেক্ষী।"[১]

---

১. সূরা কাসাস, ২৮ : ২৪।

খেয়াল করুন—নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে মাদইয়ানে পালিয়ে এসেছেন তিনি। মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই পর্যন্ত কোথাও নেই। নেই কোনো খাবারের বন্দোবস্ত। কী খাবেন, কী পরবেন, বাকি দিনগুলো কীভাবে কাটাবেন—কোনোকিছুই জানেন না।

সম্পূর্ণ নতুন এক জায়গায় যদি আপনাকে রেখে আসা হয়, যেখানে আপনার কোনো আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব নেই, কোনো পরিচিত লোক নেই, এমনকি আপনার হাতে একটা পয়সাও নেই যে আপনি থাকা-খাওয়ার সংস্থান করবেন, ভাবুন তো—এমন একটা অবস্থায় পড়লে আপনার মনের অবস্থাটা কী হবে? আল্লাহর কাছে যদি দুআ করতে হয়, আপনি তখন কীরকম দুআ করবেন?

আমি জানি আপনি কী দুআ করবেন। আপনি বলবেন— 'ইয়া আল্লাহ, আমাকে থাকার একটা জায়গা মিলিয়ে দিন। ইয়া আল্লাহ, আমাকে খাবারের বন্দোবস্ত করে দিন। ইয়া আল্লাহ, আপনি এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে আমার জন্য একটা উত্তম আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিন।'

কিন্তু দেখুন—এরকম একটা নাজুক পরিস্থিতিতে পড়েও মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে সেভাবে দুআ করেননি। তিনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাননি, মাথা গোঁজার ঠাঁই চাননি, এমনকি একবেলা আহারের ব্যবস্থার জন্যও দুআ করেননি। বরং তিনি বললেন—'আমার রব! আমার প্রতি যে অনুগ্রহই আপনি দেখাবেন, আমি তার-ই মুখাপেক্ষী!'

'আমার প্রতি যে অনুগ্রহই আপনি দেখাবেন'—এই কথাটার মানে কী?

মানে হলো—যদি আপনি আমাকে খেতে দেন তো আলহামদুলিল্লাহ, খেতে না দিলেও আলহামদুলিল্লাহ। আমাকে থাকার একটা ব্যবস্থা করে দিলেও আলহামদুলিল্লাহ, যদি আমাকে নিরাশ্রয় করে রাখেন, তা-ও আলহামদুলিল্লাহ। আমার জন্য যা কিছুই আপনি নির্ধারণ করবেন—আমি নিঃসংকোচে, নির্ভাবনায় সেগুলোকে মাথা পেতে নেবো।

আরও লক্ষণীয়—একটু আগেই কিন্তু তিনি দুজন নারীর বকরিকে পানি পান করিয়ে তাদের উপকার করেছিলেন। তিনি যদি চাইতেন, সেই কাজটাকে উসিলা করে হলেও আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে পারতেন। তিনি বলতে

পারতেন—'আমার রব! খানিক আগেই আমি আপনার দুজন নিরীহ বান্দার উপকার করেছি। তারা তাদের বকরিকে পানি পান করাতে পারছিলো না। আমি দয়াপরবশ হয়ে তাদের বকরিগুলোকে কূপ থেকে পানি তুলে খাইয়েছি। আমার এই কাজ যদি আপনি পছন্দ করে থাকেন, এর উসিলায় হলেও আপনি আমাকে মাদইয়ানে একটা থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।'

এভাবে চাওয়াটা মূসা আলাইহিস সালামের জন্য অসংগত ছিলো না মোটেও। কিন্তু তিনি সেভাবে চাইলেন না। পুরো ব্যাপারটার ভার তিনি আল্লাহর ওপরে ন্যস্ত করে দিয়ে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে সিদ্ধান্তই তাঁর জন্য স্থির করবেন—সেটাকেই সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

আল্লাহর ওপর এই যে ভরসা, বিপদের দিনে আল্লাহর প্রতি এই যে নির্ভরতা, এই নির্ভরতা আমাদের মাঝে আজ কোথায়? ঘনঘোর বিপদে তাঁরা অভিভাবক হিশেবে আল্লাহকে বেছে নিতেন, ঝুঁকে পড়তেন তাঁর সিদ্ধান্তে, নত মস্তকে মেনে চলতেন তাঁর নির্দেশনা। আর আমরা? সামান্য বিপদ-আপদে আল্লাহর কাছাকাছি যাওয়ার বদলে, আমরা বরং আল্লাহর কাছ থেকে আরও বেশি দূরে সরে যাই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ওপর সত্যিকার অর্থেই যে নির্ভর করে, আল্লাহ অতি-উত্তমভাবে তার অভিভাবক হয়ে যান। মহান রবের ওপরে নিশ্চিন্তমনে নির্ভরতার ফল মূসা আলাইহিস সালাম কিন্তু সাথে সাথেই পেয়েছিলেন সেদিন। কুরআন আমাদের জানায়—খানিক বাদেই মেয়েদের একজন এসে মূসা আলাইহিস সালামকে বলেন, 'আমার আব্বা আপনাকে ডাকছেন। আপনি আমাদের বকরিকে পানি পান করিয়েছেন, তাই আমার আব্বা আপনাকে এর বিনিময় দিতে চান।'

দুআর কী তাৎক্ষণিক প্রতি-উত্তর চিন্তা করুন! একেবারে খালি হাতে, বিদেশ-বিভুঁইয়ে, অচেনা-অজানা কোনো এক দেশের কোনো এক লোক তাঁকে ডাকছেন বিনিময় প্রদান করার জন্য! এই তো একটু আগেই তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে হাত তুলে বলেছেন—'যে অনুগ্রহই আপনি আমাকে দেবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী', আর খানিকটা পরেই তাঁর জন্য বিনিময় প্রদানের সংবাদ সমেত একজন এসে হাজির হয়ে গেলেন।

আপনি জানেন মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেদিন বিনিময় হিশেবে কী দিয়েছিলেন? একটা উত্তম আশ্রয়, একজন সৎকর্মশীলা স্ত্রী এবং একটা সুন্দর গোছানো পরিবার।

মূসা আলাইহিস সালাম কিন্তু আল্লাহর কাছে এসবের কিছুই চাননি। তিনি না আশ্রয় চেয়েছেন, না চেয়েছেন সঙ্গী হিশেবে একজন স্ত্রী, অথবা মিলেমিশে থাকার জন্য কোনো পরিবার। তিনি স্রেফ বলেছেন—আপনি যে অনুগ্রহ আমাকে দেবেন, আমি তাতেই খুশি। নিজের ইচ্ছাকে নয়, মূসা আলাইহিস সালাম বরণ করে নিয়েছিলেন আল্লাহর ইচ্ছাকেই। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হচ্ছেন আশ-শাকূর তথা উত্তম বিনিময় দাতা। দাতা হিশেবে তাঁর চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই। দেওয়া না-দেওয়ার ভারটা মূসা আলাইহিস সালাম ন্যস্ত করেছিলেন আল্লাহর ওপর। তিনি তাওয়াক্কুল করেছিলেন কেবল তাঁর প্রতিপালকের ওপর—দুনিয়ার আর কোনো সত্তার ওপর নয়। আর যারা কেবল আল্লাহর ওপরে তাওয়াক্কুল তথা নির্ভরশীল হয় তাদেরকে মহান রব কীভাবে রিযক প্রদান করেন জানেন?

> يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ
>
> "এবং (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা) তাকে এমন উৎস থেকে রিযক প্রদান করবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না। আর যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"[২]

মুখ ফুটে কিছু না চাওয়ার পরেও মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কল্পনাতীত উৎস থেকে রিযক প্রদান করেছেন। একটু আগেও তিনি ভাবতে পারেননি যে—যে কন্যাদ্বয়ের বকরির পালকে তিনি পানি খাওয়াচ্ছেন, তাদের পিতা তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে যাবেন, থাকার আশ্রয় দেবেন এবং কন্যাদের একজনকে তার সাথে বিয়ে দেবেন। রিক্ত হস্তে আসা একজন দেশান্তরীকে মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পাইয়ে দিয়েছেন জীবনে বাঁচবার জন্য যা-কিছু দরকার, তার সবটাই। খানিক আগেও যা ছিলো কল্পনারও অতীত, খানিক বাদেই তা হয়ে উঠলো দিবালোকের ন্যায় বাস্তবতা। কী অসীম দয়া আমার রবের! কতো প্রাচুর্যময় তিনি!

---

২. সূরা তালাক, ৬৫ : ০৩।

মূসা আলাইহিস সালাম আমাদের শিখিয়েছেন—দুঃখ আর দুর্দশার দিনে অস্থিরচিত্ত না হয়ে, দিশেহারা না হয়ে আল্লাহর দিকে নিবিড়ভাবে ঝুঁকতে হয়। নিজেকে আরও বেশি করে ব্যাপৃত রাখতে হয় আল্লাহর স্মরণে। তাঁর সিদ্ধান্তকে মাথা পেতে মেনে নিতে হয় এবং সর্বাবস্থায় নির্ভর করতে হয় তাঁরই ওপরে।

দুনিয়াতে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে ভূরিভূরি বই, লেকচার, আর্টিকেল আর তত্ত্বকথা পাওয়া যাবে। কিন্তু মূসা আলাইহিস সালামের এই একটা দুআকে যদি আপনি জীবনে ধারণ করতে পারেন, যদি ঘনঘোর বিপদের দিনেও আপনি সন্তুষ্টচিত্তে বলতে পারেন, 'আমার রব! আমার প্রতি যে অনুগ্রহই আপনি করবেন, আমি তার-ই মুখাপেক্ষী', বিশ্বাস করুন—এর চেয়ে ভালো কোনো ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টের পাঠ দুনিয়ার কোথাও আপনি শিখতে পারবেন না।

নীল দরিয়ার জলে

১

দরিয়ার কাছাকাছি এলে আমার দুজন পয়গম্বরের কথা মনে পড়ে যাদের একজন মূসা আলাইহিস সালাম। মূসা আলাইহিস সালামের জীবনের গল্পটা একটু অদ্ভুত—অন্য নবি-রাসূলদের চাইতে খানিকটা আলাদা। তাঁর জীবনের শুরুটাই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। পাপিষ্ঠ ফিরআউনের হাত থেকে বাঁচাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নির্দেশে মূসা আলাইহিস সালামের মা একটা বাকশোতে পুরে শিশু মূসা আলাইহিস সালামকে দরিয়ার পানিতে নিক্ষেপ করেন।

দৃশ্যটা একবার ভাবুন তো—একটা দুধের শিশুকে বাকশোতে ভরে দরিয়ায় নিক্ষেপ করে দিচ্ছে একজন মা! পৃথিবীর কোনো মায়ের পক্ষেই কি এ-ধরনের একটা কাজ সম্ভব? আপনার আম্মা কি পারতেন আপনাকে খুব ছোটোবেলায় ঠিক এভাবে বাকশো-বন্দী করে দরিয়ায় নিক্ষেপ করতে? অথবা—আপনার দ্বারা কি সম্ভব আপনার দুধের সন্তানকে বাকশোর মধ্যে ঢুকিয়ে পানিতে ছুড়ে মারা?

দুনিয়ার কোনো মা-ই এটা করতে পারে না। নারীত্বের মমতার অংশটা, মাতৃত্বের গভীর দরদটা এই জায়গায় এসে ভীষণভাবে থমকে যেতে বাধ্য। মূসা আলাইহিস সালামের মা-ও কিন্তু পারতেন না। তিনিও তো মা। মূসা আলাইহিস সালামকে তিনি গর্ভে ধরেছেন নয়টা মাস। সেই নাড়িছেঁড়া বুকের মানিককে কীভাবে তিনি নিক্ষেপ করবেন অকূল দরিয়ায়?

যেহেতু তিনি মা, তাঁর দ্বারা যে এই কাজটা বেজায় অসম্ভব, তাঁর মন যে এই কাজে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, সন্তানের জন্য তাঁর হৃদয় যে গভীর

মমতা থেকে হাহাকার করে উঠবে—তা তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানেন। মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে আল্লাহর চাইতে ভালো আর কে জানবেন দুনিয়ায়! মূসা আলাইহিস সালামের মায়ের মনের অবস্থাটাও আল্লাহর কাছে গোপন ছিলো না। কিন্তু জালিম ফিরআউনের হাত থেকে শিশু মূসাকে বাঁচাতে হলে খানিকটা নির্মম, খানিকটা নির্দয় যে হতেই হবে! এমন নির্দয় আর নির্মমতার মুহূর্তে মূসা আলাইহিস সালামের মায়ের অন্তর যাতে সুকূন তথা প্রশান্তি লাভ করে, যাতে কেটে যায় তাঁর মনের সকল ভয় আর শঙ্কা—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে শোনালেন আশ্বাসবাণী :

> فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝٧
>
> "যখন তার ব্যাপারে আশঙ্কা করবেন, তখন তাকে নিক্ষেপ করবেন দরিয়ায়। আর একদম ভয় পাবেন না এবং চিন্তিতও হবেন না। নিশ্চয় আমি তাকে আপনার কাছে ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করে নেবো।"[৩]

বনি ইসরাঈলিদের ঘরে কোনো নবজাতক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণের সংবাদ পাওয়া মাত্র ফিরআউন বাহিনী এসে সেই নবজাতকদের হত্যা করে ফেলতো। ফিরআউনের একটা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় একজন জ্যোতিষী জানিয়েছিলো—বনি ইসরাঈল সম্প্রদায়ে এমন একজন নবির আগমন ঘটবে, যার হাতে ফিরআউনের মৃত্যু হবে। নিজের মৃত্যু ঠেকাতে তাই ফিরআউন বনি ইসরাঈলিদের ঘরে জন্ম নেওয়া সকল নবজাতককে ধরে ধরে হত্যা করতো। অর্থাৎ—ভবিষ্যতে যে নবির হাতে ফিরআউনের মৃত্যু হবে বলে জানিয়েছিলো জ্যোতিষী, তাকে যেন জন্মের সাথে সাথেই মেরে ফেলা যায়। কিন্তু দুনিয়াতে কেউ তো তার ভাগ্যলিপিকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। ফিরআউনও পারেনি।

জালিম ফিরআউনের এই পাশবিকতা থেকে মূসা আলাইহিস সালামকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মূসা আলাইহিস সালামের মা'কে নির্দেশ দিয়েছিলেন কোলের শিশুকে দরিয়ায় ভাসিয়ে দিতে। আল্লাহর সেই আশ্বাসবাণী পেয়ে মূসার জননী আর দেরি করলেন না। একটা বাকশো-বন্দী করে শিশু

---

৩. সূরা কাসাস, ২৮ : ০৭।

মূসাকে তিনি ভাসিয়ে দিলেন অকূল দরিয়ার জলে। সেই থেকে দরিয়া জড়িয়ে গিয়েছে নবি মূসার জীবনে।

মূসা আলাইহিস সালামের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে নান্দনিক যে পরিণতি—সেখানেও আছে দরিয়ার উপস্থিতি। আমরা জানি—নবি মূসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দরিয়ায় তৈরি করে দিয়েছিলেন পথ এবং ওই একই দরিয়ায় তলিয়ে মেরেছিলেন জালিম ফিরআউন ও তার বাহিনীকে। জীবনের চরম সংকটময় এই মুহূর্তে মূসা আলাইহিস সালামের অবস্থান আমাকে বরাবরই মুগ্ধ করে রাখে।

সামনে অকূল দরিয়া আর পশ্চাতে ফিরআউনের বিশাল বহরের শক্তিশালী বাহিনী! এ যেন জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘের গল্পটার মতোই—দুই জায়গাতেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাতছানি! অবস্থা বেগতিক দেখে ভয়ে অস্থির হয়ে উঠলো বনি ইসরাঈল সম্প্রদায়। তারা বললো,

> إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿٦١﴾
>
> "আমরা বুঝি ধরা পড়েই গেলাম।"[৪]

অন্য সকলের মতো মূসা আলাইহিস সালামও দেখছিলেন যে—সম্মুখে যতোদূর চোখ যায় কেবল পানি আর পানি! নেই কোনো নৌকা, পারাপারের বাহন। আর পশ্চাতে একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে চিরশত্রু ফিরআউন! তিনি না সম্মুখে যেতে পারছেন, না পারছেন পেছনে যাত্রা করতে। দৃশ্যত অন্য সকলের মতো তার সামনেও যাওয়ার আর কোনো রাস্তা খোলা নেই।

কিন্তু অন্য সবার মতো তিনি ঘাবড়ে গেলেন না। যদিও খালি চোখে সম্মুখে উপনীত বিপদ এড়াবার কোনো পথ তিনি দেখছেন না, তবুও একেবারে নির্ভয় আর নির্ভার থেকে তিনি অন্যদেরকে আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে—

> كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾
>
> "কখনোই নয়। আমার রব আমার সাথে আছেন। তিনি শীঘ্রই আমাকে পথ দেখাবেন।"[৫]

---

৪. সূরা শুআরা, ২৬ : ৬১।

সম্মুখে অকূল পাথার আর পশ্চাতে ঘাড়ের ওপর পড়তে যাচ্ছে শত্রুর নিশ্বাঃস! এর মধ্যে পথ কোথায় পাওয়া যাবে? পথ যে কোথায় পাওয়া যাবে তা মূসা আলাইহিস সালাম নিজেও জানেন না। তবে তিনি এটুকু জানেন—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে পথ অবশ্যই দেখাবেন।

এরপর যা ঘটলো, তা তো রূপকথাকেও হার মানিয়ে দেয়! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দরিয়ায় মূসা আলাইহিস সালামের জন্য তৈরি করে দিলেন পথ। আর পশ্চাতে যে শত্রু পিছু নিয়েছিলো, তাকে ডুবিয়ে মারলেন ওই দরিয়ার জলেই।

ওইদিন মূসা আলাইহিস সালাম কল্পনাও করতে পারেননি যে—তাঁর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমুদ্রের মধ্যে পথ তৈরি করে দেবেন। তিনি শুধু এটুকু জানতেন—তাঁর রব তাঁর সাথে আছেন। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যার সাথে থাকেন তিনি পথের কথা ভাবেন না, ভাবেন পথের মালিকের কথা। মূসা আলাইহিস সালামও পথের মালিকের স্মরণে বিভোর ছিলেন সেদিন।

২

দরিয়ার কাছাকাছি এলে দ্বিতীয় যে পয়গম্বরের কথা আমার মানসপটে ভেসে ওঠে, তিনি হলেন নবি ইঊনুস আলাইহিস সালাম। জীবনে এক সুকঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছিলো তাঁকে। উত্তাল সমুদ্র একদিন তাঁকে নিক্ষেপ করেছিলো ফেনিল জলরাশিতে আর নবি ইঊনুস আলাইহিস সালামকে গলাধঃকরণ করে নেয় এক বিশালকায় মাছ।

গভীর সমুদ্রের তলায়, একটা মাছের পেটে বন্দী হয়ে পড়াটাকে চোখ বন্ধ করে একবার চিন্তার মধ্যে আনবার চেষ্টা করুন। কেমন সেই অবস্থা? ভাবতে গেলেও কেমন গা শিউরে ওঠে, তাই না? কল্পনাও অতোদূর পৌঁছাতে হিমশিম খেয়ে যায়। কিন্তু সমুদ্রের সেই গভীরতম তলা থেকে, মাছের পেটের সেই নিশ্ছিদ্র বন্দীত্ব থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইঊনুস আলাইহিস সালামকে ঠিক ঠিক বাঁচিয়ে এনেছিলেন।

যেখানে কোনো রাস্তা থাকে না, সেখানে তিনি রাস্তা তৈরি করে দেন। যেখানে থাকে না বাঁচার কোনো আশা, সেখানেও তিনি ফুরোতে দেন না প্রাণের ফোয়ারা। যেখানে কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার, সেখানেও তিনি জ্বালিয়ে দেন একমুঠো আলো।

তবে দুনিয়ার সকল অসম্ভবকে তিনি কাদের জন্য সম্ভব করে দেন, বলতে পারেন? কুরআন বলছে—

> وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝
>
> 'আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তৈরি করে দেন (বিপদ হতে) উত্তরণের পথ।'[৬]

দরিয়া আমাকে খুব করে টানে। নীল দরিয়ার জলের কাছাকাছি এলে আমার মনে পড়ে যায় মূসা আলাইহিস সালাম আর ইউনুস আলাইহিস সালামের কথা। আমার অন্তরাত্মার ভেতরে প্রশ্ন জাগে—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে তাঁরা যেভাবে ভয় করেছিলেন, যার কারণে সমুদ্রের বিপদ হতে তিনি তাদের উদ্ধার করেছিলেন অকল্পনীয় উপায়ে, সেরকম ভয় কি আল্লাহকে আমি করতে পারছি? জীবনে তো বিপদের অন্ত থাকে না, কিন্তু যদি আল্লাহকে যথাযথ ভয় না-ই করতে পারি, কীভাবে আশা করতে পারি যে—আমার জন্যও তিনি বের করে দেবেন উত্তরণের পথ?

দুঃখের আলপনায় স্বস্তির রং

১

আমাদের নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট নিয়ে আমরা যখন কুরআনের কাছে আসি, কুরআন তখন চমৎকারভাবে তা উপশমের উপায় বাতলে দেয়। কুরআন আমাদের মিছেমিছি সান্ত্বনা দেয় না। অথবা—আমাদের দুঃখ-কষ্টকে অগ্রাহ্য করে সেসব এড়িয়েও যায় না। দুঃখবোধ উপশমে কুরআন আমাদের এমন এক পথ বাতলে দেয়, যা বাস্তব এবং যা ব্যক্তির মানসিক গঠনের জন্য বিস্ময়করভাবে সহায়ক। দুঃখ-কষ্টের ব্যাপারে কুরআনের ভাষ্য হলো—

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

"নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি।"[৭]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন স্বস্তি রয়েছে দুঃখ-কষ্টের মাঝে। আপাতদৃষ্টিতে দুটো বিষয়কে সম্পূর্ণ বিপরীত মনে হলেও, কুরআনের ভাষ্যমতে দুটো বিষয় যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কষ্টের সাথে স্বস্তি কীভাবে থাকতে পারে? আমি বোঝার চেষ্টা করলাম।

ধরা যাক একজন লোকের ঘরে কোনো খাবার নেই। ক্ষুধায়-অনাহারে সকলে ক্লান্ত। চরম দুঃখ-কষ্টে কাটছে তাদের দিন। এমতাবস্থায় তার জন্য স্বস্তি কোথায়?

মজার ব্যাপার হচ্ছে—স্বস্তি বা সুখ যা-ই বলি না কেন, সেটাকে আমরা সংজ্ঞায়িত করেছি টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ আর সচ্ছলতা দিয়ে। এসবের অনুপস্থিতিকে আমরা বুঝি দারিদ্র্য আর দুঃখ-কষ্ট হিশেবে। সুখকে এভাবে

---

৭. সূরা ইনশিরাহ, ৯৫ : ০৫।

বুঝতে গিয়ে মাঝখান থেকে আমরা যে সত্যিকার জিনিসটাকে পাশ কেটে যাই, তা হলো—অন্তরের প্রশান্তি। খুবই দুঃখ আর দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করেও, নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশার ভেতর দিয়ে গেলেও একজন মানুষের অন্তরে প্রশান্তি থাকতে পারে। আবার দুনিয়ার সেরা ধনী ব্যক্তি হয়েও, দুনিয়াজোড়া নাম-ডাক থাকা সত্ত্বেও একজন ব্যক্তির অন্তর সর্বদা বিক্ষিপ্ত আর বিষণ্ন থাকতে পারে।

যে ব্যক্তির ঘরে খাবারের সংকট, সে যদি তার সর্বোচ্চটা দিয়ে কাজ করে এবং তারপরও পর্যাপ্ত খাবার জোগাড়ে ব্যর্থ হয়, পরিবারের সকলকে নিয়ে সে যে শাক-ভাত খাচ্ছে, নতুবা একবেলা খেয়ে একবেলা উপোস করছে—তাতে কিন্তু তার আফসোস থাকে না কোনো। সে জানে এটুকুই তার রিযক। সে এটাকেই সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়। তার সামনে যদি হারাম পথে পা বাড়িয়ে রিযক তালাশের কোনো সুযোগ আসে, যেমন—চুরি-ডাকাতি করা, অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া, লোক ঠকিয়ে টাকা রোজগার করা—এমন সুযোগকে সে পায়ে ঠেলে দেয়। কারণ সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ভয় পায়। পরিবার নিয়ে সে উপোস করতে করতে মরে যেতে রাজি, কিন্তু হারামের পথে এক কদম দিতে সে রাজি নয়।

নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও তাকওয়ায় টইটম্বুর অন্তর নিয়ে যখন সে সালাতে দাঁড়ায়, দুনিয়ার সকল দাতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে যখন সে চোখের পানি ফেলে কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা 'আর-রাযযাক'-এর দিকে মুখ ফেরায়, তখন ক্ষুধা-অনাহারের কষ্ট, সংসারের ঘানি টানবার অপরিসীম ক্লান্তি—সমস্তকিছুকে তার সাময়িক পরীক্ষা মনে হয় এবং সে জানে এর উত্তম প্রতিদান তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। অন্তত দুনিয়াতে না হোক, অনন্ত আখিরাতে তার রব তাকে এতো পরিমাণ দেবেন যে সে খুশি হয়ে যাবে।

আবার দুনিয়া-সেরা কোনো এক ধনী লোক, ধরা যাক তার বি-শা-ল একটা ব্যবসায়িক প্রজেক্ট একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে মুখ থুবড়ে পড়লো। এখন তার অন্তরে যদি তাওয়াক্কুল না থাকে, এই প্রজেক্টকে সে যে-কোনো-প্রকারে, ন্যায়-অন্যায়ের বাছ-বিচার না করে দাঁড় করাতে চাইবে। তাতে কার কী ক্ষতি হলো, কার কী এলো-গেলো তা নিয়ে সে একটুও ভাববে না। সে শুধু ব্যবসা বোঝে আর বোঝে টাকা। কেবল টাকা হাতে এলেই সে শান্তি পায়।

তার অন্তরে যদি তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর ওপর ভরসা না থাকে, তার এহেন ক্ষতিকে সে 'তাকদীর' হিশেবে মেনে নিতে চাইবে না। এই ক্ষতিকে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা এবং এর বিনিময়ে দুনিয়া কিংবা আখিরাতে উত্তম বিনিময় লাভের যে ধারণা ইসলাম দেয়—সেটাকে সে পাত্তা দেবে না। ফলে তার যদিও অঢেল সম্পদের পাহাড়, তথাপি যেকোনো ক্ষতিতে, যেকোনো সমস্যায় সে বিচলিত হয়ে পড়ে। তার অন্তর থেকে বিলুপ্ত হয় প্রশান্তি। এমন বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন আর বিষণ্ন অন্তর নিয়ে সে যদি কোটি টাকার বিছানায় ঘুমায়, দুনিয়ার সেরা মডেলের গাড়িতে চড়ে, তবুও সেই শান্তি সে পায় না, যে শান্তি ক্ষুধা পেটে নিয়ে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে ওই দরিদ্র ব্যক্তি পায়।

২

সূরা আল-ইনশিরাহতে 'কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি' কথাটা পরপর দুইবার উল্লেখ করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। তাফসীর ইবনু কাসীরে একই আয়াত একেবারে হুবহু শব্দচয়নে দুইবার উল্লেখের একটা সুন্দর ভাষাতাত্ত্বিক দিক আলোচনায় এসেছে। আরবি ভাষার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—আলিফ এবং লাম যুক্ত শব্দকে পুনরায় যদি আলিফ এবং লাম যুক্ত করে ব্যবহার করা হয়, তাহলে উভয় শব্দের অর্থ একই থাকে, বদলায় না। তবে যদি একই শব্দ পরপর ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তাতে আলিফ আর লাম যুক্ত না থাকে, তাহলে দুই শব্দ দিয়ে সবসময় একই বস্তু বোঝাবে না।

সূরা আল-ইনশিরাহতে 'কষ্ট' বোঝাতে দুই আয়াতেই عُسْرٌ (উস্‌র) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং দুই জায়গাতেই শব্দটার সাথে আলিফ এবং লাম যুক্ত আছে। অর্থাৎ—দুই জায়গায় এই শব্দ দিয়ে মূলত একটা জিনিসকেই বোঝানো হয়েছে, আর তা হলো—কষ্ট। কিন্তু ওই একই আয়াত দুটোতে 'স্বস্তি' বোঝাতে যে শব্দ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ব্যবহার করেছেন তা হলো— يُسْرٌ (ইউস্‌র)।

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, কষ্ট বোঝাতে তিনি যে 'উস্‌র' শব্দ নির্বাচন করেছেন তাতে আলিফ আর লাম যুক্ত থাকলেও, স্বস্তি বোঝানোর জন্য যে 'ইউস্‌র' শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন, তার কোনোটাতেই আলিফ-লাম নেই।

কুরআনের ভাষাবিদগণ বলছেন—আয়াত-দ্বয়ে 'উস্‌র' শব্দের সাথে আলিফ আর লাম যুক্ত থাকায় তা দিয়ে একটা জিনিসই বোঝানো হয়েছে—কষ্ট। কিন্তু, আয়াত-দ্বয়ে 'ইউস্‌র' শব্দের সাথে আলিফ-লাম যুক্ত না থাকায় তা দিয়ে 'একই স্বস্তি' বোঝানো হয়নি, বরং হরেক রকমের স্বস্তি তথা পুরস্কারকে বোঝানো হয়েছে।[৮]

একেবারে সহজ করে যদি বলা হয়—সূরা আল ইনশিরাহতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একইরকম কষ্টের বিনিময়ে বান্দাকে হরেক রকমের প্রতিদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। বান্দা যে দুঃখ-কষ্টগুলো ভোগ করে দুনিয়াতে, তার বিপরীতে সে পাবে অনেক অনেক বেশি প্রতিদান।

কুরআনে বর্ণিত নবি-রাসূলদের ঘটনাগুলোতে চরম দুঃখ-কষ্টের মাঝেও তাদেরকে যে আমরা খুব স্থিরচিত্ত হিশেবে দেখি, এর কারণ হলো এই—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এই প্রতিদানের ব্যাপারে তারা ছিলেন সম্যক অবগত। কষ্টের সাথে তখনই স্বস্তি থাকে, যখন অন্তরে তাকওয়া আর তাওয়াক্কুলের জোয়ার আসে।

ছুটে আসে আগুনের ফুলকি

'আল-বুরূজ' আমার খুব প্রিয় একটা সূরা। এই সূরায় আসহাবুল উখদূদের একটা ঘটনা আছে। ঘটনাটি যেমন হৃদয়বিদারক, তেমনই মর্মস্পর্শী। ঘটনাটি এমন—অতীতে একজন বাদশাহর অনুগত একজন জাদুকর ছিলো। জাদুকর যখন বৃদ্ধবয়সে উপনীত হলেন, তখন বাদশাহকে ডেকে বললেন—'আমার তো মৃত্যুর সময় সন্নিকটে, আপনি আমাকে বুদ্ধিমান একটা বালক জোগাড় করে দিন। আমি আমার সমস্ত বিদ্যা তাকে শিখিয়ে দিয়ে যাই।'

জাদুকরের কথামতো বাদশাহ অনেক খোঁজখবর করে, অনেক যাচাই-বাছাই করে রাজ্যের সবচেয়ে বুদ্ধিমান বালকটাকে জাদুকরের দ্বারস্থ করলো। সেই বুদ্ধিমান বালক প্রতিদিন রাজদরবারে যাওয়া-আসা শুরু করলো আর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলো সেই জাদুকরের।

রাজদরবারে রোজ যাওয়া-আসার পথে বালক একজন ধার্মিক ব্যক্তির সন্ধান পায়, যে সারা দিনমান আল্লাহর স্মরণে নিজেকে মশগুল করে রাখেন। আগ্রহ থেকে সেই ধার্মিক ব্যক্তির সাথেও মেলামেশা শুরু করে ওই বালক। একটা সময় ধার্মিক ব্যক্তিকেও তার পছন্দ হয়ে যায়।

রাজদরবারে যাওয়ার পথে একদিন একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটলো! বালকটা দেখলো—রাস্তার ওপর বসে আছে এক বিশাল ভয়ংকর প্রাণী। সেই প্রাণীর আকৃতি আর তার ফোঁসফোঁসানিতে পথচারীরা ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলো। মোদ্দাকথা—মানুষের চলাচলের পথে প্রাণীটা বেশ বিঘ্ন সৃষ্টি করে রেখেছে।

বালকটা ছিলো যথেষ্টই বুদ্ধিমান। উদ্ভূত পরিস্থিতি দেখে সে ভাবলো, 'আজ জাদুকর আর ধার্মিক ব্যক্তির একটা পরীক্ষা হয়ে যাক। আজকে আমি নির্ণয় করতে চাই কে সত্যিকার আমলদার আর কে সত্যি সত্যিই আল্লাহর কাছে প্রিয়—জাদুকর না সেই ধার্মিক ব্যক্তি।'

এতোটুকু ভেবে ওই বালক একটা পাথরের টুকরো হাতে নিয়ে এভাবে দুআ করলো—'ইয়া আল্লাহ, যদি ধার্মিক ব্যক্তির আমল তোমার কাছে জাদুকরের আমলের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে থাকে, ওই উসিলায় তুমি চলাচলের রাস্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা এই প্রাণীটাকে মেরে ফেলো।'

দুআ করা শেষে বালক ওই পাথর খণ্ডটা ছুড়ে মারলো প্রাণীটার দিকে এবং সে দেখলো—ওইটুকুন পাথরের আঘাতে বিশালাকার সেই প্রাণী সত্যি সত্যিই মরে গেলো! বালক এতে যারপরনাই বিস্মিত হলো এবং ধার্মিক ব্যক্তির কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললো। সবকিছু শুনে ধার্মিক ব্যক্তি বললেন, 'আমার সন্তান, তুমি আমার চেয়েও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছো। তবে—সাথে সাথে শুরু হতে চলেছে তোমার পরীক্ষাও। তোমাকে পাড়ি দিতে হবে বেশ কণ্টকাকীর্ণ পথ। শোনো বাবা, কোনো অবস্থাতেই রাজা কিংবা তার লোকের কাছে তুমি আমার নাম বলে দিয়ো না যেন।'

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই বালককে জন্মান্ধত্ব আর শ্বেত রোগের চিকিৎসা করার গুণ দান করেন। এই ধরনের কোনো রোগী পেলে বালক বলতো, 'আপনি যদি মহামহিম রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ওপরে ঈমান আনেন, তাহলে তাঁর কাছে আপনার রোগ মুক্তির জন্য আমি প্রার্থনা করবো। আমার দৃঢ় আশা—আমার রব আমার প্রার্থনা শুনবেন।'

রোগীরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনতো এবং বালক আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতো তাদের রোগ মুক্তির জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার প্রার্থনায় সাড়া দিতেন এবং সারিয়ে দিতেন রোগ। একদিন রাজার এক সহচরের রোগও ওই বালক এভাবে সারিয়ে দেয়।

পাঁচ কান সাত কান হয়ে এই সংবাদ রাজার কানে পৌঁছালে রাজা বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। নিজের ধর্ম এবং বিশ্বাসের জন্য ওই বালককে রাজা চিহ্নিত করে হুমকি হিশেবে। রাজা আদেশ জারি করে—ওই বালককে পাহাড়ের চূড়ায় তুলে

সেখান থেকে ফেলে যেন হত্যা করা হয়।

রাজার আদেশকে শিরোধার্য মেনে কতিপয় লোক ওই বালককে টেনেহিঁচড়ে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যায়। যে-ই না তারা বালককে ধাক্কা দিয়ে পাহাড় থেকে ফেলতে যাবে, তখনই বালক আল্লাহর কাছে দুআ করতে শুরু করে। বালকের দুআ শুরু হতেই গোটা পাহাড় থরথর করে কাঁপতে থাকে এবং বালক ব্যতীত অন্য সকলে সেই পাহাড় থেকে পড়ে মরে যায়।

প্রথম উপায়ে বিশ্বাসী সেই বালককে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়ে রাজা এবার দ্বিতীয় উপায় বের করলো। তার সভাসদকে বললো—'ওকে ধরে নৌকায় করে মাঝ দরিয়ায় নিয়ে যাও। সেখানে নিয়ে গিয়ে তাকে নিক্ষেপ করো অথৈ জলে। দেখি এবার কে বাঁচায় তাকে।'

রাজার কথামতো কিছু লোক বালককে ধরেবেঁধে নৌকাতে করে মাঝ নদীতে নিয়ে এলো। এবারও বালক আগের মতো দুআ করতে শুরু করলে সবাইকে নিয়ে আস্ত নৌকা উল্টে যায়। বালক ব্যতীত সেবারও নৌকার সকলে নদীর পানিতে ডুবে মারা যায়।

বালককে হত্যার সব পরিকল্পনা যখন ভেস্তে যেতে লাগলো, রাজার কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ যখন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগলো, তখন সমাধানের বার্তা নিয়ে হাজির হলো স্বয়ং বালক নিজে। বললো—'আমাকে যদি হত্যা করতেই চাও, আমি তোমাদের একটা অব্যর্থ উপায় বাতলাতে পারি।'

-'কী উপায়?'—জানতে চাইলো রাজা।

-'খোলা একটা ময়দানে লোকেদের জমায়েত করো। তারপর, 'بِسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلَامِ' (বালকের রব আল্লাহর নামে) বলে আমার দিকে নিক্ষেপ করো তীর। দেখবে—তীরের আঘাতে আমি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছি।'

বালকের কথামতো রাজা তা-ই করলো। একটা খোলা প্রান্তরে রাজ্যের অনেক লোক জমায়েতের ব্যবস্থা করা হলো। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সারা রাজ্যময় করে দেওয়া হলো ব্যাপারটা। রাজ্যের মানুষদের কাছে বালকের ব্যাপারে আগে থেকেই আগ্রহ ছিলো। রাজার কাছে নিজের মৃত্যুর উপায় নিজে বাতলে দিয়ে সেই আগ্রহের মাত্রাকে যেন আরও তুঙ্গে তুলে আনলো বালক।

উপস্থিত অগণিত মানুষের সামনে, বালকের বাতলে দেওয়া উপায় মতো, রাজার জল্লাদ 'বিসমিল্লাহি রাব্বিল গোলাম' বলে বালকের দিকে তীর নিক্ষেপ করলো। এবং তীর বালকের গায়ে এসে লাগা মাত্রই বালক ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে।

যাকে এতো কসরত করেও রাজা হত্যা করতে পারছিলো না, তাকে তার বাতলে দেওয়া উপায়ে যখন হত্যা করা গেলো, উপস্থিত জনতার বুঝতে আর কিছু বাকি থাকলো না। তারা বুঝে গেলো যে—সত্য এই বালকের ঈমান। সত্য সেই রব, যে রবের প্রতি ঈমান এনেছে সে। উপস্থিত লোকেরা সমস্বরে বলতে শুরু করলো, 'আমরা ঈমান আনলাম বালকের রবের প্রতি', 'আমরা ঈমান আনলাম বালকের রবের প্রতি।'

লোকজনের কথা শুনে রাজার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো! পরিস্থিতি যে এভাবে ভোজবাজির মতো পাল্টে যাবে, এভাবে হিতে বিপরীত হয়ে ব্যাপারটা তার দিকেই যে ফিরে আসবে, সেটা রাজা চিন্তাও করতে পারেনি। একসাথে রাজ্যের এতোগুলো লোক স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করে এক সাধারণ বালকের ধর্ম গ্রহণ করে নেবে—এতোটা ঘোলাটে পরিস্থিতির জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলো না রাজা।

কিন্তু মানুষজনকে দমানোর উপায় কী? রাজা তখন জায়গায় জায়গায় অনেকগুলো গর্ত খননের আদেশ করলো। সেই গর্তে জ্বালানো হলো আগুন। আগুনের লেলিহান শিখা যখন বাতাসের সাথে দাউ দাউ করে উঠতে লাগলো, রাজা বললো, 'শোনো লোকসকল! তোমরা যদি বালকের ধর্ম ত্যাগ না করো, গর্তের এই আগুনের মাঝে তোমাদের আমি পুড়িয়ে মারবো।'

কে শোনে কার কথা! লোকেদের সামনে তখন সত্যের ঝলকানি। সেই ঝলকানির কাছে মিইয়ে পড়ছে লেলিহান আগুনের শিখা। তারা রাজার কথায় কর্ণপাত করছে না মোটেও। ঈমানের যে স্বাদ খানিক আগে আস্বাদন করেছে, সেটায় তারা পাহাড়ের মতো অবিচল থাকলো।

রাজাও অটল থাকলো নিজের জিদে। সৈন্যবাহিনীদের আদেশ করলো যেন লোকেদের ধরে ধরে লেলিহান সেই আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করে। রাজার কথামতো তার সৈন্যরা ঈমান আনয়ন করা মানুষগুলোকে টেনেহিঁচড়ে এনে ফেলতে লাগলো আগুনের সেই কুয়োয়। লোকেরা ঈমান আনলো এবং সাথে সাথে বরণ করে নিলো শাহাদাতের মৃত্যু। পরিশেষে এক মা তার কোলের

শিশুকে নিয়ে আগুনে লাফিয়ে পড়তে ইতস্তত বোধ করছিলো, তা দেখে কোলের সেই শিশু বলে উঠলো, 'মা, ধৈর্যধারণ করো। তুমি তো সত্য ধর্মের ওপরেই আছো।'[৯]

এই হলো সূরা আল-বুরূজে আলোচ্য আসহাবুল উখদূদের ঘটনা।

২

আসহাবুল উখদূদের ঘটনাটার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

> وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝
>
> "আর তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিলো শুধু এই কারণে যে—তারা মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিলো।"[১০]

মানুষগুলোর দোষ কেবল একটাই—তারা ঈমান এনেছিলো মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি। ছুড়ে ফেলেছিলো তাদের যাবতীয় ভ্রান্ত বিশ্বাস। সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করা মাত্রই তারা একটুও দ্বিধা করেনি তা বরণ করে নিতে। তাদের অপরাধ কেবল এতোটুকুই। এতেই জালিম রাজা তাদেরকে নিক্ষেপ করেছিলো লেলিহান আগুনের শিখার মাঝে। পুড়িয়ে হত্যা করেছিলো তাজা তাজা প্রাণগুলো।

এই আয়াতের মাঝে আজকের দুনিয়ার অনেক চিত্রের কী ভীষণ মিল খুঁজে পাওয়া যায়! দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে শুধু 'মুসলিম' হওয়ার কারণে কতো ভাই-বোনকেই আজ বরণ করতে হচ্ছে ঠিক একই ভাগ্য! যেহেতু তারা মুসলমান, তাই তাদের বাঁচবার অধিকারটুকুও যেন থাকতে নেই। ডিটেনশান ক্যাম্পে বন্দী করে তাদেরকে অনাচার-অনাহারে হত্যার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। প্রতিনিয়তই কেড়ে নেওয়া হয় তাদের বাড়িঘর। বোমার আঘাতে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় তাদের স্বপ্নগুলো।

---

৯. বিস্তারিত দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ২৪/২৭৩; ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৮/৩৬৭-৩৬৮; কুরতুবি, তাফসীর, ১৯/২৮৭-২৮৮; বাগাবি, তাফসীর, ৮/৩৮৩-৩৮৪; মুসলিম, ৩০০৫।

১০. সূরা বুরূজ, ৮৫ : ০৮।

তাদের অপরাধ আসহাবুল উখদূদের ঘটনার সেই মানুষগুলোর মতোই—দুনিয়ার সমস্ত মিথ্যা ইলাহকে বাদ দিয়ে তারা কেবল এক মহামহিম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদাত করে।

৩

সূরা আল-আসরে নিরন্তর 'ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবে' এমন মানুষদের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

> إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣
>
> "তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং উপদেশ দেয় ধৈর্যের।"[১১]

আসহাবুল উখদূদের ঘটনায় যে মানুষগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিলো, তাদের অপরাধ কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ওপর ঈমান আনয়ন। ঈমান আনার পর তারা না সৎকর্ম করার সুযোগ পেলো, না সুযোগ পেলো পরস্পরকে সত্য আর ধৈর্যের দিকে আহ্বানের। শুধু ঈমান আনয়নের কারণে যারা সেই সকল মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছিলো, তাদের ভর্ৎসনা করে মহামহিম আল্লাহ বলেছেন,

> قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ۝١
>
> "ধ্বংস হয়েছে গর্তের অধিপতিরা।"[১২]

'গর্তের অধিপতি' বলতে এখানে কেবল রাজাকে বুঝানো হয়নি। বরং রাজার সেই আদেশ যারা পালন করেছে, গর্ত খুঁড়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে ঈমানদারদের হত্যা করার বুদ্ধি যার মাথা থেকে বেরিয়েছে, যারা গর্ত খুঁড়েছে, যারা সেই দৃশ্য দেখে আনন্দে আটখানা হয়েছে—তাদের সকলকেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 'গর্তের অধিপতি' সম্বোধন করে ভর্ৎসনা করেছেন আর বলেছেন—'তারা ধ্বংস হয়েছে।'

---

১১. সূরা আসর, ১০৩ : ০৩।

১২. সূরা বুরূজ, ৮৫ : ০৪।

শুধু ঈমান আনার কারণে যারা ঈমানদারদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছিলো, তাদের ভর্ৎসনা করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি এভাবে হুঁশিয়ারি প্রদান করেন, তাহলে যারা ঈমান আনলো, সৎকর্ম করলো এবং পরস্পরকে সত্য আর ধৈর্যের দিকে ডাকতে লাগলো, সেই সমস্ত দ্বীনের দাঈ, তাকওয়াবান আলিম, পরহেযগার বান্দা, আল্লাহর দ্বীন প্রচারকারী সে সমস্ত মহাত্মাদের ওপর যারা হিংস্র হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে, দুনিয়ার জেলে তাদের বন্দী করে যখন নির্যাতন চালায়, তাদের পরিবারগুলোকে যখন নিঃস্ব করে দেওয়া হয়—দুনিয়ার সেই সমস্ত জালিমদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হুঁশিয়ারি তাহলে কেমন হবে? কী বীভৎস আযাব তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন এদের জন্য, ভাবতে পারেন?

৪

একজন লোক মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকছে দেখে আপনার গা রাগে রি রি করে। আপনি ভাবেন—তাতে করে বোধহয় অমুক আর তমুক দলের উপকার হচ্ছে। সেই দলগুলো ভারী হচ্ছে। কেউ কাউকে সালাতের দিকে আহ্বান করছে, সুন্নাহ পালনের তাগিদ দিচ্ছে, সততা আর সত্যবাদিতার সবক দিচ্ছে দেখে আপনি মনে করেন—সে বুঝি অমুক দলের কর্মী বাড়ানোর কাজ করছে। আপনার সেই সন্দেহপ্রবণ আর খুঁতখুঁতে মন নিয়ে আপনি লেগে পড়লেন সেই দাঈ'র পেছনে। সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাকে দমানোর চেষ্টা করলেন। হুমকি দিয়ে, ধমক দিয়ে। পুলিশ আর হামলা-মামলার ভয় দেখিয়ে। তাকে শারীরিক নির্যাতন করতেও পিছপা হলেন না।

একজন লোক মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করছে দেখে যদি আপনি তার ওপর হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েন, যদি তাতে আপনার দল ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আপনি বিপন্ন করে দেন ওই দাঈ'র জীবন, তাহলে আপনার উচিত আল্লাহর হুঁশিয়ার-বার্তার দিকে একটুখানি নজর দেওয়া।

إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ﴿١٠﴾

"নিশ্চয় যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে আযাব দেয়, তারপর তাওবা করে না, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব এবং কঠিন দহন যন্ত্রণা।"[১৩]

৫

দুনিয়ার অত্যাচারীরা ভাবে তাদের শক্তিমত্তা বুঝি চিরস্থায়ী। তারা বোধকরি চিরদিন টিকে থাকবে। আসহাবুল উখদূদের সেই অত্যাচারী রাজা আর তার সাঙ্গপাঙ্গরাও সেটাই মনে করেছিলো। কিন্তু তা আর হলো কোথায়! টিকতে পেরেছে তারা? ঠেকানো গেছে তাদের ধ্বংসলীলা? দুনিয়ার কোনো জালিমই কি আসলে তা পারে? পারে না। সূরা আল-বুরূজের শুরুতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন এই মর্মে যে—

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُوْدِ ﴿٤﴾

"ধ্বংস হয়েছে গর্তের অধিপতিরা।"[১৪]

একই সূরার শেষের দিকে এসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন সেই চিরন্তন বাস্তবতাকেই—দুনিয়াতে পূর্বের কোনো জালিমই চিরস্থায়ী হয়নি, চিরস্থায়ী হবে না পরের কোনো জালিমও।

هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ﴿١٨﴾

"আপনার কাছে কি সংবাদ পৌঁছেছে সে-সকল সৈন্যবাহিনীর? ফিরআউন আর সামূদ জাতির?"[১৫]

---

১৩. সূরা বুরূজ, ৮৫ : ১০।

১৪. সূরা বুরূজ, ৮৫ : ০৪।

১৫. সূরা বুরূজ, ৮৫ : ১৭-১৮।

যারা একদা নিজেদের ভেবেছিলো অদ্বিতীয়-অবিনশ্বর-অপরাজেয়, সেই ফিরআউন বাহিনী আর সামূদ বাহিনীও বিলুপ্ত হয়েছে। ইতিহাস তার জ্বলজ্বলে সাক্ষী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের উদাহরণ টেনে বোঝাচ্ছেন যে— আগের জালিমেরা কেউ টিকতে পারেনি, ধ্বংস হয়েছে। পরের জালিমেরাও টিকবে না।

জালিম, জুলুম আর মাজলুমের ব্যাপারে সূরা আল-বুরূজ যেন আমার সামনে একটা জীবন্ত আয়না হয়ে ওঠে। যেন সেই আয়নায় আমি দেখতে পাই ফিরআউন বাহিনীর ডুবে মরার দৃশ্য। সামূদ বাহিনীর ধ্বংসলীলা যেন আমার চোখের তারায় ভাসতে থাকে। আমি যেন শুনতে পাই আসহাবুল উখদূদের আর্তচিৎকার, যখন আযাবের লেলিহান আগুনের ফুলকিরা ছুটে আসছে তাদের ভস্ম করে দিতে।

ব্যাকুল হৃদয়ের আকুল সঙ্গীত

সূরা দোহা আমাদের প্রায় সবার অত্যন্ত প্রিয় একটি সূরা। মন খারাপের দিনে মুমিন ব্যক্তির জীবনে ছোট্ট এই সূরা যেন মহৌষধ হিশেবে কাজ করে। আর করবেই-বা না কেন? স্বয়ং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এই সূরাটা একপ্রকার 'স্বস্তি' হিশেবে নাযিল হয়েছিলো।

আমাদের মন খারাপের দিনে, অলস দুপুর আর উদাস বিকেলে যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে অন্তর, যখন জানা-অজানা কারণে হৃদয়টা কেবল ছটফটায়, যখন নাভিশ্বাস উঠে যায় মাঝে মাঝে, জীবন থেকে যখন আমাদের পালাতে ইচ্ছে করে ভীষণভাবে, সূরা আদ-দোহা যেন তখন আমাদের ঠিক ঠিক পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। আমরা তখন স্মরণ করি সূরা আদ-দোহার সেই আয়াতগুলো, যেগুলোতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুনিয়েছেন আশা এবং ভরসার ঐশী বাণী। আল্লাহর যে কথাগুলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অশান্ত হৃদয়কে প্রশান্ত করেছিলো। গুমোট হয়ে থাকা জীবনের জন্য যে আয়াতগুলো ছিলো ঝিরিঝিরি বাতাসের মতো স্নিগ্ধতায় ভরা।

> مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝٣ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝٤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝٥
>
> "নিশ্চয় আপনার রব আপনাকে পরিত্যাগ করেননি আর না তিনি আপনার ওপর অসন্তুষ্ট।
>
> 'নিশ্চয় আপনার জন্য পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা উত্তম।
>
> 'শীঘ্রই আপনার রব আপনাকে এতো বেশি দেবেন যে আপনি খুশি হয়ে যাবেন।"[১৬]

---

১৬. সূরা দোহা, ৯৩ : ০৩-০৫।

দুঃখের ভারে নুইয়ে পড়া অন্তরে, বেদনায় মরচে ধরা হৃদয়ে এই আয়াতগুলো যেন রহমতের বারিধারা হয়ে ধরা দেয়। এই আয়াতগুলো যেন জীবন নিয়ে নতুনভাবে ভাবার, নতুন করে বাঁচার তাগিদ দিয়ে যায় বারেবার। আমরা উপলব্ধি করি—যে খারাপ সময়ের ভেতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি, যে দুঃখের প্লাবনে হাবুডুবু খাচ্ছে জীবন—তা শীঘ্রই কেটে যাবে। নতুন ভোরের সোনারঙা আলোয় ভরে উঠবে আমাদের মনের উঠোন। সম্মুখে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে এক সুন্দর পরিণতি; এই সব দুঃখ আর মন খারাপ সেই পরিণতিতে পৌঁছানোর সিঁড়ি মাত্র।

দুঃখের অতল গহ্বর থেকে টেনে তোলা সূরা আদ-দোহার সেই আয়াতগুলো নিয়ে আমরা অনেক ভেবেছি, এখনো ভাবি এবং ভবিষ্যতেও ভাববো, ইন শা আল্লাহ। সেখান থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলোকে নিজেদের জীবনে ধারণ করে আমরা সুখ আর স্বস্তিময় করে তুলবো আমাদের দুঃখের মুহূর্তগুলোকে। তবে সূরা আদ-দোহার আয়াতগুলো নিয়ে বেশ অনেক ভাবনা-চিন্তা করা হলেও, এই সূরা নাযিলের পেছনে যে নেপথ্য কাহিনী, সেই কাহিনীতেও যে রয়েছে এক চমৎকার ভাবনার খোরাক, তা আমরা জানি কি?

সূরা আদ-দোহা নাযিলের প্রেক্ষাপট আমরা সকলেই কমবেশি জানি। একবার বেশ লম্বা একটা সময়, অনেক তাফসীরকারকদের মতে প্রায় পনেরো দিন[১৭] টানা ওহি নাযিল বন্ধ থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবিজির কাছে কোনো বার্তা পাঠান না। জিবরাঈল আলাইহিস সালামও আসা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছেন। নিয়মিতভাবে নাযিল হতে থাকা ওহির ধারাবাহিকতায় এমন ছন্দপতন নবিজিকে বেশ আশঙ্কায় ফেলে দিলো। তিনি বেশ অস্থির হয়ে উঠলেন।

এই সুযোগটা লুফে নিতে একটুও ভুল করেনি মক্কার মুশরিকরা। এতোদিনে তারা মনের মতো একটা মওকা পেয়েছে, যেটা নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ত্যক্ত করা যাবে। তাঁর অনুসারীদেরকেও করা যাবে বিভ্রান্ত। তারা দলে দলে ভাগ হয়ে জনে জনে বলে বেড়াতে লাগলো, 'দেখেছো দেখেছো, মুহাম্মাদের রব মুহাম্মাদকে ছেড়ে চলে গেছে। তার কাছে যে একজন

---

১৭. সময়টা নিয়ে মতভেদ রয়েছে—১২ দিন, ২৫ দিন এবং ৪০ দিনের কথাও কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন।

আসতো বলে মুহাম্মাদ দাবি করতো, সে-ও নাকি আসা বন্ধ করে দিয়েছে।'[১৮]

ওহি নিয়ে জিবরাঈল আলাইহিস সালামের আগমন বন্ধ থাকায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মন এমনিতেই বেশ অশান্ত, তার ওপর এই প্রসঙ্গ টেনে মুশরিকেরা যেভাবে হাস্য-কৌতুকে মেতে উঠেছে তা দেখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মন খারাপ আরও বেড়ে গেলো কয়েকগুণ। এক নিঃসীম বিষণ্ণতায় ছেঁয়ে গেলো নবিজির মন। একদিকে ওহি আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার বেদনা, অন্যদিকে মুশরিকদের ক্রমাগত মানসিক আঘাত। সব মিলিয়ে নবিজি যেন বিধ্বস্ত হয়ে পড়লেন তখন।

সেই বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে টেনে তুলতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরকার ছিলো এমনকিছু, যা মুহূর্তে ভালো করে দেবে তাঁর মন। তাঁর হৃদয়ের ছটফটানিকে প্রশমিত করতে, অন্তরের বিপন্ন অবস্থাকে স্থির করতে এবং সর্বোপরি মক্কার মুশরিকদের অপবাদের জবাব দিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে পাঠালেন সূরা আদ-দোহা সমেত। রৌদ্রের প্রচণ্ড দাবদাহে পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া জমিনে বৃষ্টির ফল্গুধারা যেরকম প্রাণের সঞ্চার করে, সূরা আদ-দোহা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তর-কাননের জন্য ছিলো তার চাইতেও বেশি কিছু।

সূরা আদ-দোহা নিয়ে আমাদের আলোচনায় আমরা অনেক বিষয়, অনেক পাঠকে সামনে আনার চেষ্টা করি, কিন্তু সেসব আলোচনায় যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা বাদ পড়ে যায় তা হলো—এই সূরা নাযিলের নেপথ্যের কাহিনীটা। কাহিনীটা আমরা জানি বটে, কিন্তু তা নিয়ে গভীর ভাবনা-চিন্তা কখনো হয়তো ওভাবে করা হয়নি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওহি পাঠাচ্ছেন না বলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অশান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বহুদিন হয় জিবরাঈলকে তিনি তাঁর কাছে আসতে দেখছেন না। কেন হঠাৎ করে কুরআন নাযিল বন্ধ হয়ে গেলো? কেন আকাশপানে তিনি আর দেখতে পান না জিবরাঈলের আগমন বার্তা? তবে কি তাঁর কোনো ভুল হয়ে গেছে, যার কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া

---

১৮. তাবারি, তাফসীর, ২৪/৪৮৪-৪৮৬; ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৮/৪২৪-৪২৬; কুরতুবি, তাফসীর, ২০/৯২; সা'লাবি, তাফসীর, ২৯/৪৬৮।

তাআলা তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন?

এই সমস্ত ভাবনা আর দুশ্চিন্তা কুরে কুরে খাচ্ছিলো নবিজিকে। কে জানাবে তাঁকে এসবের উত্তর? কে বাতলে দেবে সমাধানের পথ? যেকোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছ থেকে সমাধান নিয়ে এসে যে জিবরাঈল নবিজিকে পথ দেখাতেন, আজ বহুদিন হয় তাঁর দেখা নেই। এটা কি স্বাভাবিক কোনো ব্যাপার?

যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পরিত্যাগ করেন, তার জীবনের আর মূল্যটাই-বা কী! মানসিক অশান্তি আর শত্রুপক্ষের নিরন্তর কথার আঘাত—সব মিলিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন পার করছেন জীবনের কঠিন এক সময়। এরকম শ্বাসরুদ্ধকর আর গুমোট সময়ের সাক্ষী হয়ে আছে সূরা আদ-দোহা। সূরাটার নাযিলের এই যে প্রেক্ষাপট, এখান থেকে আমাদের শিখবার কী আছে?

নবিজির সমস্ত ব্যাকুলতা ছিলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন কি না, তা ভেবে। আল্লাহর সান্নিধ্য ছিলো নবিজির কাছে জীবনের সবচেয়ে সেরা প্রাপ্তি। ওহির মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে যে নিত্য-নৈমিত্তিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সেটাই তাঁর কাছে সমস্ত প্রাপ্তি, সমস্ত চাওয়া, সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে। এই প্রাপ্তির চেয়ে বড় কোনো প্রাপ্তি নেই। এই ভালোবাসার চাইতে মধুর কোনো প্রণয় নেই। এই সম্পর্কের চাইতে সুন্দর কোনো বন্ধন নেই।

যখন এই প্রাপ্তিতে সাময়িক বিরতি এলো, এই সম্পর্কে যখন নেমে এলো মুহূর্তের ছন্দপতন—নবিজি তখন জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা'-কে হারিয়ে ফেলার আশঙ্কায় দিশেহারা হয়ে পড়লেন। আল্লাহকে হারানোর এই ব্যাকুলতা, এই আবেগ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুভব করতে পেরেছিলেন; কারণ আল্লাহর সাথে তাঁর সম্পর্কটা ছিলো একেবারে অন্যরকম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে তিনি ততোখানি ভালোবেসেছিলেন যতোখানি ভালোবাসলে সামান্য দূরত্বকেও মহাকালের সমান দীর্ঘ লাগে।

আমরা যদি আমাদের জীবনের দিকে তাকাই, আমাদের জীবনের কোথাও কি

আমরা আল্লাহর জন্য সেই ব্যথা, সেই আবেগ আর ব্যাকুলতা অনুভব করি, যা করতে পেরেছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম? যখন দুআ করেও আমরা কোনো ফলাফল দেখতে পাই না, আমরা কি কখনো এভাবে ভেবেছি যে—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে পরিত্যাগ করেননি তো? এমন কোনো পাপ কি আমি করেছি, যার কারণে আমার রব অসন্তুষ্ট হয়ে আমার দুয়া কবুল করছেন না?

শত চেষ্টা করেও যখন আমাদের চাকরি হয় না, আমরা কি তখন এভাবে ভাবি যে—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি কোনোভাবে আমার ওপর নারাজ? তাঁর অসন্তুষ্টির কারণেই কি কঠিন হয়ে উঠেছে আমার রিয্‌কের রাস্তা?

যখন আমাদের কোলজুড়ে আসে না কোনো সন্তানাদি, কোনো এক বিষণ্ণ দুপুরে আমরা কি কখনো এভাবে ভেবেছি—কারও সাথে আমি কোনো অপরাধ করে বসিনি তো? জীবনের কোথাও কারও ওপর জুলুম করার কারণেই কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে কোনো সন্তানাদি দিচ্ছেন না?

আমাদের ব্যবসা থেকে বারাকাহ উঠে যায়, সংসারে অশান্তি বিরাজ করে, সময়ে-কাজে আমরা কূলিয়ে উঠতে পারি না। সালাতে মন বসে না, কুরআন তিলাওয়াতে অন্তর নরম হয় না, খুব সহজে আমরা ডুবে যাই হারামের মাঝে। এতো সব অন্যায়, পাপ আর পঙ্কিলতার মাঝে নিমজ্জিত হয়ে কখনো একটাবারের জন্য আমরা নীরবে-নিভৃতে ভেবেছি কি—হায়! কেন আমার জীবনটা এতো এলোমেলো, এতো অগোছালো? কেন আমার জীবন থেকে ছন্দ হারিয়ে গেছে? কেন আমার হৃদয় থেকে লুপ্ত হয়েছে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, কুরআনের জন্য প্রেম আর দ্বীনের জন্য দরদ? তবে কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে সত্যিই পরিত্যাগ করেছেন? তবে কি সত্যিই আমি অনুসরণ করছি শয়তানের পদচিহ্ন? তবে কি সিরাতে মুসতাকীম ছেড়ে আমি হাঁটতে শুরু করেছি জাহান্নামের দিকে? আমি কি বেছে নিয়েছি ধ্বংসের পথ? রব হিশেবে আল্লাহর বদলে আমি কি গ্রহণ করেছি আমার প্রবৃত্তিকে? তবে কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে আমি সত্যিই হারিয়ে ফেলেছি? হায়! আল্লাহকে হারিয়ে কী-ই বা পাওয়া হবে আমার?'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যদি এই প্রশ্নগুলো নিজেরা নিজেদের করতে পারি,

জীবন থেকে আল্লাহর অনুগ্রহ হারিয়ে গেছে ভেবে যদি সেভাবে ব্যাকুল হতে পারি, যেভাবে ওহি আসা বন্ধ হওয়ায় ব্যাকুল হয়েছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যদি হৃদয়ের গভীর থেকে চাইতে পারি রবের ভালোবাসা এবং ছেড়ে আসতে পারি সমস্ত অবাধ্যতা আর পঙ্কিলতার পথ—তবে সূরা আদ-দোহার সেই সমস্ত সুসংবাদকে আমরা আমাদের জন্যও ভাবতে পারি, যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন—

"নিশ্চয় আপনার রব আপনাকে পরিত্যাগ করেননি আর না তিনি আপনার ওপর অসন্তুষ্ট।"

"নিশ্চয় আপনার জন্য পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা উত্তম।"

"শীঘ্রই আপনার রব আপনাকে এতো বেশি দেবেন যে আপনি খুশি হয়ে যাবেন।"

সূরা আদ-দোহা নাযিলের এই নেপথ্য কাহিনীকে যদি আমরা ধারণ করতে পারি জীবনে, আল্লাহর সন্তুষ্টিকে যদি বানিয়ে নিতে পারি আমাদের ব্যাকুল হৃদয়ের আকুল সঙ্গীত, আশা করা যায়—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কখনোই আমাদের ছেড়ে যাবেন না।

যে আঁধারের রং নীল

সূরা আল-ফালাকে আমরা বহুবিধ জিনিসের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই এবং সেই অনিষ্টগুলোর একটা হলো—'আচ্ছন্ন হয়ে আসা রাত্রির অনিষ্ট।'

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝٣

"(আর আমি আশ্রয় চাইছি) রাতের অনিষ্ট থেকে, যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে আসে।"[১৯]

তাফসীরকারকগণ এই আয়াতের বেশ কয়েকটা ব্যাখ্যা করেছেন। এমনিতে রাত থেকে পানাহ চাওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ নেই যদিও, তথাপি এখানে 'আচ্ছন্ন হয়ে আসা রাতের অনিষ্ট' বলতে তারা যে কয়েকটা বিষয় সামনে এনেছেন তা হলো—রাতে ক্ষতিকর প্রাণী এবং পোকামাকড়ের বিচরণ বেড়ে যায় বলে এখানে সেসব থেকে পানাহ চাওয়া হয়েছে। রাতে ক্ষতিকর আত্মারা, অর্থাৎ যে সমস্ত খারাপ জিন মানুষের অপকার সাধন করে, তাদের বিচরণও বাড়ে বলে এখানে সেসব থেকেও পানাহ চাওয়া হয়েছে। এছাড়া যে-সকল মানুষের মনে খারাপ অভিসন্ধি কাজ করে, যারা খুব অপরাধ-প্রবণ, খুন-খারাবি, ডাকাতি-রাহাজানির সাথে জড়িত, তারাও তাদের জন্য উপযুক্ত সময় হিশেবে রাতকে বেছে নেয় বলে এখানে রাতের সে সমস্ত খারাপি থেকে পানাহ চাওয়া হয়েছে।[২০]

এ-সকল ব্যাখ্যা তো আছেই, সেসবের সাথে কেউ কেউ আরও একটা ব্যাপার যোগ করেছেন আর তা হলো—রাত নামলে শয়তান তার ওয়াসওয়াসা নিয়ে

---

১৯. সূরা ফালাক, ১১৩ : ০৩।

২০. কুরতুবি, তাফসীর, ২০/২৫৬-২৫৭; ওয়াহিদি, আত-তাফসীরুল বাসীত, ২৪/৪৬০-৪৬১; যুহাইলি, আত-তাফসীরুল মুনীর, ৩০/৪৭৫; মাওয়ারদি, তাফসীর, ৬/৩৭৫।

মানুষের মনে জোরালোভাবে প্রবেশ করে এবং তাকে নিমজ্জিত করায় নানাবিধ পাপে। তাই অন্ধকার রাতে এ-সমস্ত শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচতে আল্লাহর কাছে এখানে সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

রাতের অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে এলে শয়তানের ওয়াসওয়াসা বেড়ে যায়। চিন্তা করে দেখুন তো—উত্তর-আধুনিক কালে আমাদের হাতে থাকা স্মার্টফোনগুলো শয়তানের সেই ওয়াসওয়াসার কাজে 'মেঘ না চাইতে জল' হিশেবে আবির্ভূত হয়েছে কি না!

আজকালকার দিনে পর্নোগ্রাফিতে, অশ্লীল জিনিসে যারা জড়িয়ে আছে, তাদের এ-সকল কাজের পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকাটা রাখে হাতে থাকা স্মার্টফোন। রাতে সাধারণত মানুষের তেমন কাজ থাকে না। কিন্তু যুগ এতো বদলেছে যে—কাজ না থাকাটাই এখন যেন সবচেয়ে বড় কাজ। গভীর রাত পর্যন্ত স্মার্টফোনে চোখ ডুবিয়ে রাখা, মাইলের পর মাইল সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রলিং, নানান ভিডিও দেখা, গেমস খেলা ইত্যাদি করতে যেন আমাদের কোনোই ক্লান্তি নেই। শয়তান তাকে বেহুদা কাজে সময় ব্যয় করতে সারাক্ষণ ফুসলায়। শয়তানের ফাঁদে পা দিয়ে আস্তে আস্তে এ ভিডিও থেকে ও-ভিডিও, এই সাইট থেকে ওই সাইট, এই লিঙ্ক থেকে ওই লিঙ্ক করতে করতে সে যে কখন কোন চোরাবালিতে ডুবে যায়, তার কোনো খেয়াল থাকে না। সে একটা মজা পেয়ে যায় এবং বুঝতে পারে—এ-সকল কাজে ব্যয় করার জন্য রাতটাই যুতসই সময়। সে অপেক্ষা করে থাকে—কখন রাত নামবে, কখন সে একাকী হবে, কখন তার আশেপাশে আর কেউ থাকবে না এবং কখন সে আবার ডুব দেবে প্রতিদিনের চোরাবালিতে। শয়তান তাকে এমনভাবে শৃঙ্খলবন্দী করে রাখে যে—এই শৃঙ্খল ভাঙার ব্যাপারে তার ভেতর কোনো তাড়নাই কাজ করে না।

সূরা আল-ফালাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়া শিখিয়েছেন, যে অন্ধকার রাতে মানুষ ডুব দেয় আরও গভীর অন্ধকারে। ঘরজুড়ে অন্ধকার, কিন্তু কোনো এক কোণায় ফোন থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এক টুকরো নীল আলো। সেই নীল আলো মানুষকে টেনে নিয়ে যায় নীল-রঙা অন্ধকারের জগতে। ঊষার রব আমাদেরকে সেই অন্ধকার এবং তার অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকবার তাওফীক দান করুন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা, বিন্দু বিন্দু জল

একটা ডকুমেন্ট ফটোকপি করার জন্য একবার একটা দোকানে যাই। দোকানে খুব বেশি ভিড় ছিলো না। ফটোকপি করার দায়িত্বে যিনি ছিলেন, তাকে বেশ ভদ্র এবং বিনীত গলায় আমি বললাম, 'ভাই, যদি একটু তাড়াতাড়ি কাজটা করে দেন তো খুব উপকার হয়। একটু পরেই ব্যাংকিং আওয়ার শেষ হবে। সময়মতো না যেতে পারলে তারা আমার কাজটা করতে চাইবে না।'

আমার অনুরোধটুকু তার কাছে কীরকম মনে হলো বলতে পারবো না। তিনি বেশ কটমটে চেহারায় এবং বিতৃষ্ণ গলায় জবাব দিলেন, 'এতো তাড়াহুড়ো করলে পারবো না ভাই। অপেক্ষা করতে হবে। আমার পরিচিত লোকজন এখানে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কাজ রেখে আপনার কাজ করে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

আমি তার কথায় খানিকটা দমে গেলাম বটে, তবে তার শব্দচয়নটা আমার মাথার মধ্যে কীভাবে যেন গেঁথে গেলো। তিনি আমাকে বলতে পারতেন, 'আপনার আগে আসা লোকও এখানে অপেক্ষা করে আছে, তাদের কাজ না করে আপনার কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার যদি খুব তাড়াহুড়ো থাকে, পাশের দোকান বা অন্য কোনো দোকান থেকে কাজটা করে নিতে পারেন, ভাই।'

যদি তিনি এভাবে আমার কাছে তার অপারগতা তুলে ধরতেন, আমি সত্যিই খুব খুশি হতাম। কিন্তু তিনি ভদ্রতার মাথা খেয়ে আমাকে জানালেন যে, তার পরিচিত লোকজনের কাজ রেখে আমার কাজ তিনি করতে পারবেন না, যদিও আমি তার সেই পরিচিতজনদের আগেই এসেছি।

সে যাহোক, তিনি তার সুবিধামতো সময়েই কাজটা আমাকে করে দিয়েছেন;

আমার পরে আসা তার পরিচিতজনদের কাজ শেষ করে।

তবে, তিনি যে দোকানে ফটোকপি মেশিন নিয়ে বসেছিলেন বা যে লোকের অধীনে তিনি কাজ করেন, সেখানে—ঘটনাচক্রে ওই দোকান মালিক আমার পূর্ব-পরিচিত এবং আমাদের মাঝে বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

বেশ অদ্ভুতভাবে, আমি যখন ওই দোকান থেকে বের হতে যাবো, ঠিক তখনই সেখানে আমার ওই বন্ধু, অর্থাৎ দোকান-মালিক এসে হাজির হলেন এবং আমাকে দেখামাত্রই তিনি বেশ সরস গলায় বললেন, 'আরে, ভাইসাহেব যে! কখন এলেন? আপনাকে তো আজকাল দেখাই যায় না। কী খবর, কেমন আছেন?'

যদিও আমার খানিকটা তাড়াহুড়ো ছিলো; কিন্তু বিনয়ের খাতিরে তাকে উপেক্ষা করে যাওয়া সম্ভবপর ছিলো না বলে আমাকেও মজে যেতে হলো খানিকটা খোশ আলাপে।

আমাদের এরকম খোশ আলাপে মশগুল হতে দেখে ফটোকপি মেশিনের দায়িত্বে-থাকা-সেই লোক বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন বলে মনে হলো। তার চোখেমুখে বিস্ময় এবং চেহারায় বিপন্ন অবস্থা! তিনি বোধহয় কল্পনাতেও ভাবতে পারেননি যে, একটু আগে যার সাথে তিনি কড়া ভাষায় কথা বলেছিলেন, সে তার মালিকের বন্ধু মহলের কেউ। আর বিপন্ন বোধ করার কারণ হতে পারে এই—তিনি মনে করেছেন খানিক আগে তার রূঢ় আচরণের ব্যাপারে আমি তার মালিকের কাছে অভিযোগ জানাবো এবং এতে করে তার চাকরিটা চলে যাবে।

মানুষের এই আচরণটা আমার কাছে বড্ড অদ্ভুত লাগে! এখানে সবাই নিজ নিজ চেয়ারে নিজেদের এতো প্রতাপশালী ভাবে যে, নিতান্ত সৌজন্যতাবোধ এবং মানবিকতাটুকুও তাদের মধ্য থেকে লোপ পেতে শুরু করে। আমি তার পরিচিত হলে কিন্তু ঠিকই আমার কাজটা দ্রুততা সহকারে করে দিতো। তাতে যদি আমার আগের দশজনকে অপেক্ষায় রাখতে হতো, তবুও। অথবা, আমি যদি দোকানে ঢুকেই তাকে দোকান মালিকের পরিচয় দিতাম এবং বলতাম যে, আপনার মালিক আমার ঘনিষ্ঠজন, তখন কিন্তু সে নিজের চেয়ার ছেড়ে আমাকে বসতে দিতো এবং দরকারে আপ্যায়ন করাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতো। কাজের টাকা তো নিতোই না, দিতে গেলেই লজ্জায় পড়ে যেতো।

এই যে দুটো অবস্থায় দুরকম আচরণ—এই দ্বিচারিতা মানুষ কেন করে?

আমার ধারণা—অন্তরে তাকওয়ার অভাব থেকেই সাধারণত মানুষ এমনটা করে থাকে। মানুষ ভাবে—কেবল মসজিদে গেলেই শুধু তারা আল্লাহর পর্যবেক্ষণের আওতায় আসে। অথবা সালাতে দাঁড়ালেই কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের দিকে মনোনিবেশ করেন। এর বাইরে— দুনিয়ায় আর বাদ বাকি যা কিছু তারা করে, এসবের কোনোটাই মনে হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তদারকি করেন না বা তিনি সেসবে নজরও দেন না। এমন ধারণা থেকেই কি মানুষ ইবাদাতের বাইরে অনেক বেশি অন্যায়, অন্যায্য কাজ আর জুলুমে নিয়োজিত হয়ে যায়? হতে পারে।

আমাদের অতিবাহিত প্রতিটা সেকেণ্ড, প্রতিটা মিনিট, প্রতিটা পদক্ষেপ আল্লাহ তদারকি করছেন। আমরা যা কিছু করি; ন্যায্য বা অন্যায্য, ভালো বা মন্দ, সুন্দর বা কুৎসিত—সবকিছুতেই মহান রবের রয়েছে সমান দৃষ্টি।

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

> "তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, আল্লাহ সারাক্ষণ তোমাদের সাথে আছেন এবং তোমরা যা-কিছুই করো, তা সম্পর্কে তিনি অবশ্যই ওয়াকিবহাল।"[২১]

আমাদের কোনো পদক্ষেপ-ই আল্লাহর নজর এড়ায় না। এমনকি—ঘুমের মধ্যে আমরা যখন পার্শ্ব পরিবর্তন করি বা অসাবধানে মাড়িয়ে যাই একটা ক্ষুদ্র পিঁপড়া, সেসব ঘটনাও। পরিচিত নয় বলে আমি একজনের সাথে রূঢ় আচরণ করলাম, তাকে কড়া ভাষায় জবাব দিলাম, তার কাজ দ্রুত করে দেওয়ার অবকাশ থাকলেও করে দিলাম না, অন্যদিকে যখন সেই অপরিচিত লোকটা মালিকপক্ষের পরিচিত হয়ে ওঠে, তখন ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকলাম—এসব কি আল্লাহর নজর এড়ায়?

কোনো কাজ আমি আজকে করে দেওয়ার এখতিয়ার রাখি, কিন্তু জবাবে বললাম, 'আজকে হবে না। অন্যদিন আসেন।' অথচ যখন অফিসের বস ফোন করে বলেন, 'অমুকের কাজটা দ্রুত করে দেন', তখন কিন্তু সুড়সুড় করে আমি

---

২১. সূরা হাদীদ, ৫৭ : ০৪।

তার কাজটা করে দিই। একটু আগে যাকে জবাবে 'হবে না' বলেছিলাম, বসের ফোন পেয়ে যখন সেই একই কাজ আমি মিনিট কয়েকের মধ্যে সেরে দিই, আমার ওই মুহূর্তের দ্বিচারিতা কি আল্লাহ্ দেখেন না?

আমাদের সামান্য অবহেলা, সামান্য অবজ্ঞা, সামান্য খবরদারি—এসবের কোনোকিছুই আল্লাহর নজর এড়ায় না। এমন টুকরো টুকরো বিষয়গুলো যখন কিয়ামতের দিন আমার জন্য আল্লাহর দরবারে অভিযোগ হিশেবে জমা হবে, কতোখানি ভারী হবে সেই অভিযোগের পাল্লাটা, ভাবা যায়? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমল যেভাবে আমলের পাল্লাটাকে ভারী করবে বেশি, তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনাচার, অবিচার আর অন্যায্য ব্যাপারগুলোও 'পাপের পাল্লা'কে ভরে তুলবে। আমরা তো সকলে পড়েছি—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা, বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল...

আলো জ্বেলে যাই

বদর যুদ্ধের সময় মুসলমানদের হাতে অনেক মুশরিক বন্দী হয়। সেই বন্দী মুশরিকদের মুসলমানরা অতি সামান্য মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত করে দিতে চাইলে মুশরিকদের কাছে সেই সামান্য মুক্তিপণটাও 'বি-শা-ল' হয়ে দাঁড়ালো! ওই যৎসামান্য মুক্তিপণটুকু দিতেও তাদের যেন রাজ্যের অনীহা!

যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বসে আছে, কোথায় চেষ্টার সর্বোচ্চটা দিয়ে মুক্ত হবে তা নয়, তারা গোঁ ধরেছে মুসলমানদের তারা কোনোভাবেই মুক্তিপণ দেবে না। যদি দিতেও হয়, মুসলমানরা যে পরিমাণটা দাবি করছে, সেই পরিমাণ দিতে তারা ইচ্ছুক নয়।

যেহেতু ইতঃপূর্বে মুসলমানদের তারা নিদারুণ কষ্ট দিয়েছে, তাদের জান-মালের ক্ষতি সাধন করেছে এবং সর্বোপরি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও নিপতিত হয়েছে, সুতরাং—ধরাশায়ী হওয়ার পর মুসলমানদের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে তাদেরকে যা ইচ্ছে করবার। মুসলমানরা চাইলে তাদের প্রত্যেককে হত্যা করতে পারে নতুবা বন্দী করে রাখতে পারে আজীবনের জন্য। মুশরিকদের কোনো সুযোগ নেই এতে আপত্তি জানায়।

কিন্তু 'বসতে দিলে শুতে চায়' বলে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তা বোধকরি মক্কার মুশরিকদের মজ্জাগত ছিলো। মুক্তিপণের বিনিময়ে তারা মুক্তি পাবে সেটা তাদের কাছে বড় নয়, তাদের কাছে বড় হয়ে ধরা দিলো সামান্য মুক্তিপণটাই। তারা মোচড়ামুচড়ি শুরু করলো ব্যাপারটা নিয়ে।

এই জায়গায় আমরা একজন ক্ষমতাবান রাজাকে কল্পনা করতে পারি। ধরা যাক—অন্য এক রাজ্যের সাথে লড়াই করে তিনি বিজয়ী হলেন এবং তার হাতে জমা হলো অসংখ্য যুদ্ধবন্দী। সেই যুদ্ধবন্দীদের প্রাণে না মেরে তিনি মুক্ত করে

দিতে চান, তবে তা একেবারে বিনামূল্যে নয়। সামান্য মুক্তিপণের বিনিময়ে।

রাজা চাইলেই তাদের মৃত্যুদণ্ড দিতে পারতেন, কিন্তু রাজার মহিমায় তারা জানে বেঁচে গেলো এ-যাত্রায়। এমন মহানুভবতা যদি কোনো রাজা দেখায়, যুদ্ধবন্দীরা রাজাকে মর্যাদার কোন আসনে বসাবে ভাবুন তো? তারা নত-মস্তকে রাজাকে কুর্নিশ করবে আর জোর গলায় রাজার মহিমা কীর্তন করবে। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শত্রুর গলায় তিনি তলোয়ার না উঠিয়ে খুলে দিতে যাচ্ছেন তাদের দেহের বাঁধন। এমন উপকারের কথা এক-জনমে ভোলা যায়?

কিন্তু এই দয়া আর মহানুভবতার কথা বিস্মৃত হয়ে, তারা যদি সেই রাজাকে উল্টো প্রশ্ন করে বসে কেন তাদের মুক্তিপণ দিতে হবে, কিংবা রাজার আদেশ পালনে তারা যদি গড়িমসি করে, তখন কেমন হবে সেই রাজার মেজাজ-মর্জি?

স্বভাবতই রাজা অসম্ভব রেগে যাবেনা রাগে গজগজ করতে করতে তিনি সেনাপতিকে নির্দেশ দেবেন সব ক'টাকে হয় হত্যা করতে, নতুবা কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিতে পুরে তিলে তিলে মেরে ফেলতে। রাজা হুংকার ছেড়ে বলতে পারেন—'আমার দয়াকে যখন তোমরা অধিকার মনে করেছো, তখন আমাকে দয়ার বদলে দায়িত্ব সারতে হয়। যাও, এবার কঠিন ভাগ্যকে বরণ করো তোমরা।'

দুনিয়ার রাজাদের ক্ষেত্রে এই আচরণটা খুব স্বাভাবিক এবং যুতসই। কিন্তু বদরের যুদ্ধের যুদ্ধবন্দীরা, যারা মুক্তিপণ দিতে কার্পণ্য করছিলো, যাদের মধ্যে মুক্তিপণ প্রদানে দেখা গিয়েছিলো রাজ্যের অনীহা, তাদের উদ্দেশ্য করে আসমান আর জমিনের বাদশাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কী বলেছেন জানেন? সূরা আল-আনফালের ৭০ নম্বর আয়াতে তিনি বলেছেন,

إِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ

> "তোমাদের অন্তরে যদি আল্লাহ ভালো কিছু দেখতে পান, তাহলে (মুক্তিপণ হিশেবে) তোমাদের কাছ থেকে যা নেওয়া হয়েছে, তার চাইতে উত্তম কিছু তিনি তোমাদের প্রদান করবেন।"

প্রথমত, তারা ছিলো মুসলমানদের জন্য ভয়ংকর শত্রু। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো মুসলমানদের জন-জীবন! দ্বিতীয়ত, তারা সকলে যুদ্ধবন্দী। যুদ্ধবন্দী হিশেবে তাদের সাথে যেকোনো ব্যবহার করার অধিকার মুসলমানদের

আছে। তৃতীয়ত, মুক্তিপণ আদায়ে কার্পণ্য করে তারা বস্তুত আল্লাহর সিদ্ধান্তকেই অসম্মান করছিলো। এই অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইচ্ছা করলে তাদের মুখোমুখি করতে পারতেন চরমতম শাস্তির।

এতদসত্ত্বেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুনিয়ার কোনো রাজার মতো করে গর্জে ওঠেননি। রাগ আর ক্ষোভে ফেটে পড়ে সকলকে হত্যা করার কিংবা জীবনের তরে কারাগারে পুরে রাখার নির্দেশ দেননি। বরং তিনি যা বললেন, তা হলো—এইটুকু মুক্তিপণ তোমরা দাও। দিয়ে তোমাদের মুক্ত করো। এরপর আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরগুলোতে কোনো ভালোর সন্ধান পান, যদি তোমরা সত্য আর মিথ্যের প্রভেদ বুঝতে পারো, যদি তোমরা আল্লাহর রাসূল যে সত্য নিয়ে এসেছেন তা অনুধাবনে সক্ষম হও, সত্যিকার আলোর দিকে যদি তোমাদের অন্তরগুলো ঝোঁকে, তাহলে আল্লাহ তোমাদের সাথে ওয়াদা করছেন—তোমাদের কাছ থেকে আজ যা আদায় করা হচ্ছে, তার চেয়ে অনেকগুণ উত্তম কিছু তিনি তোমাদের প্রদান করবেন।

আচ্ছা, এমন দয়া, এমন মহানুভবতার দৃষ্টান্ত ইসলাম ছাড়া মানুষ আর কোথায় পাবে বলুন তো?

ব্যক্তিগতভাবে এই আয়াত আমাকে একটু অন্যভাবেও ভাবালো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুশরিকদের সাথে ওয়াদা করছেন যে—যদি তাদের অন্তরে ভালো কিছু তিনি খুঁজে পান, তিনি তাদের এমন বিনিময় প্রদান করবেন, যা তাদের কাছ থেকে আদায় করা বস্তুর চাইতে উত্তম।

ভাবুন তো, এই আয়াতটা কি আমাদের বেলাতেও সমানভাবে খাটে না? আমাদের অন্তরেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি কোনো ভালোর সন্ধান পান, যদি কোনো ভালো অভিপ্রায় আমাদের অন্তরের মাঝে বিদ্যমান থাকে, তবে কি তিনি আমাদের এমন উত্তম বস্তু দেবেন না, যা আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া বস্তু থেকে উত্তম?

আমরা যারা জীবন থেকে হারিয়ে ফেলেছি প্রিয়তম বন্ধু, যাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে কোনো জীবনসঙ্গী বা পরম আত্মীয়, যারা হারিয়ে ফেলেছে তাদের বাবা-মা, কোলের মানিক সন্তানকে, কিন্তু তারা ধৈর্য হারায়নি, বিচলিত হয়নি...

অথবা,

রিযক তালাশে যারা পার করছে কঠিন সময়, যাদের ব্যবসাতে মন্দা, সংসারে অসচ্ছলতা, যাদের সামনে চাকরির দুষ্প্রাপ্যতা। কিন্তু তবুও তাদের হৃদয় ভরতি তাওয়াক্কুল...

কিংবা,

যৌবনের উন্মত্ততা সত্ত্বেও যারা বেপরোয়া নয়, যারা ফিতনার কঠিন সময়েও নিজের চরিত্রকে হেফাযতের জন্য নিরন্তর লড়াই করে যাচ্ছে, সমাজের, পাড়া-প্রতিবেশীর, পরিবারের হাজারো কটুকথা, নিন্দাকে গায়ে না মেখে যারা যারা নিজেদের আবৃত করে রাখছে পর্দায়, সকলের তিরস্কার উপেক্ষা করে যারা মুখে রেখে দিচ্ছে দাড়ি...

এই যে অন্তরের এই সমস্ত 'ভালো'-কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি মূল্যায়ন করবেন না? অবশ্যই করবেন। এসবের পেছনে আমাদের যে ত্যাগ আর সংগ্রাম, একদিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এসবের বিনিময়ে আমাদের অতি-অবশ্যই উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন।

বিনিময় প্রদানের বেলায় আল্লাহর চাইতে উদার আর কে আছে জগতে? আমাদের কাজ কেবল অন্তরের আলোটাকে জ্বালিয়ে রাখা। শত ঝড়-ঝঞ্ঝাট, বাধা-বিপত্তিতে কোনোভাবেই সে আলোটাকে নিভতে না দেওয়া।

চাঁদে যারা জমি কিনছেন

১

কয়েকদিন থেকে একটা খবর চাউর হয়েছে—দেশের কেউ কেউ পৃথিবীর সীমানা ছাপিয়ে চাঁদের দেশে জমি কিনছেন। প্রথমদিকে ব্যাপারটাকে মনে হয়েছিলো নিছক তামাশা। কিন্তু পর পর কয়েকটা মেইনস্ট্রিম মিডিয়ায় ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি দেখে কৌতূহল থেকে ব্যাপারটা নিয়ে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করলাম। এখন পর্যন্ত মনে হলো ব্যাপারটা গুজব নয়—সত্যি।

আপনি হয়তো ভাবছেন, 'চাঁদের জমি বিক্রি করছে কোনো এলিয়েন, তাই তো?'

আপনার জায়গায় আমি হলে ব্যাপারটাকে সেভাবেই ভাবতাম। কিন্তু সত্যি কথা হলো—যিনি চাঁদে জমি বিক্রি করছেন তিনি কোনো এলিয়েন নন, আমাদের মতোই রক্ত-মাংসের মানুষ। নাম তার ডেনিস হোপ। আমেরিকার এই নাগরিক লুনার অ্যাম্বেসী ডট কম নামে একটা সাইট খুলে দেদারসে বিক্রি করে দিচ্ছেন সৌরজগতের সকল গ্রহ-উপগ্রহ আর নক্ষত্রকে। একমাত্র তেজস্বী সূর্যকেই তিনি এখন অবধি নিলামে তুলতে পারেননি। বাদ বাকি মঙ্গল, প্লুটো, শনি, বৃহস্পতি, বুধ থেকে শুরু করে রোমান্টিকতার সর্বোচ্চ সম্বল চাঁদকেও তিনি বিক্রিবাট্টা করে ইউরোপ-আমেরিকায় প্লট বাগাচ্ছেন। এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্য মতে—সৌরজগতের কোনো অংশ যদি আপনি ডেনিস হোপের লুনার অ্যাম্বেসী ডট কম থেকে কিনেন, তারা আপনাকে ক্রয়কৃত অংশের একটা ম্যাপ, ক্রয়ের একটা সার্টিফিকেট এবং সেখানকার একটা পাসপোর্টও ধরিয়ে দেবে!

ব্যাপারটার মধ্যে যে একটা উষ্ণ আবেগ আর গদগদ আত্মম্ভরিতা আছে, তা তো বোঝাই যায়। যেহেতু হাল আমলের ট্রেন্ড, সেহেতু অনেক উষ্ণ আবেগী লোকজন সেটাকে 'কী না কী পেয়েছি' ধরে সেদিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে। ট্রেন্ডের ছোঁয়ার বাইরে থাকেনি বাংলাদেশও। আমাদের দেশের কয়েকজনও ইতোমধ্যেই চাঁদের নাগরিক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন বলে সংবাদমাধ্যম তরফে জানতে পেরেছি।

২

তবে, প্রিয় পাঠক—মহাজাগতিক কোনো এক জগতে বাস করবার আপনার যে উদগ্র বাসনা, সেই বাসনায় আমি কোনোভাবেই পানি ঢেলে দিতে চাই না। অনুর্বর মরা মরুভূমির ভগ্নাংশের মতো জীর্ণকায় চেহারার চাঁদে বসবাসের চাইতে আপনাকে আমি দিতে পারি এমন এক মহাজাগতিক জগতের সন্ধান, যে জগতে আলো-বাতাসের কোনো কমতি নেই। যে জগৎ ফুলে-ফলে সুশোভিত। যেখানে আছে কলকল ধ্বনির ঝরনা, যা প্রবাহিত হবে আপনার পায়ের নিচ দিয়ে। সারি সারি স্বর্ণ-রৌপ্য-মুক্তো খচিত অপরূপ দালানকোঠা! আছে দিগন্তবিস্তৃত নানান রঙের দৃশ্যপট, যা দেখে আপনার দৃষ্টি স্থির হয়ে যেতে চাইবে অনন্তকালের জন্য।

আমার বাতলে দেওয়া সেই মহাজাগতিক জগতের সন্ধান পেতে আপনাকে আমি ডেনিস হোপের লুনার অ্যাম্বেসীতে টুঁ মারতে বলবো না। কিংবা আপনাকে হয়ে উঠতে বলবো না জেফ বেজোস যা ইলন মাস্কের মতো টাকার কুমির। আপনার ঘরের আলমিরার কোণে বড্ড অযত্ন-অবহেলায় পড়ে থাকা কুরআনটা খুলে, সূরা আল-ওয়াকিআর মাঝে আপনাকে চোখ বুলাতে বলবো শুধু। সেখানে আমাদের রব সেই মহাজাগতিক জগতে আমাদের জন্য কী অভাবনীয় নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন, তার খুব সামান্য কিছু বর্ণনা এসেছে : যদি তা বানাতে পারেন জীবনের সারথী, তাহলে আপনার জন্যই—

أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿١٢﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿١٤﴾ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿١٥﴾ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ﴿١٦﴾ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿١٩﴾ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾ وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾

"তারাই হবে নৈকট্যপ্রাপ্ত।
সেখানে তারা থাকবে সুখময় জান্নাতসমূহে।
তাদের অধিকাংশ হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে
আর পরবর্তীদের মধ্য থেকে হবে অল্পসংখ্যক।
(সেখানে তারা বসবে) স্বর্ণ ও অমূল্য পাথরখচিত আসনে;
তারা সেগুলোতে হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখি হয়ে।
তাদের চারপাশে ঘুরঘুর করবে চির-কিশোরেরা
পানপাত্র, জগ ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে।
সেই সুরা পানে তাদের মাথাব্যথা হবে না, লোপ পাবে না জ্ঞানও,
সেখানে থাকবে তাদের পছন্দের ফলমূল
আর পাখির গোশত, যা তাদের মন চাইবে।
এবং থাকবে আয়তলোচনা হূর;
যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তো।
(এসবকিছু তারা পাবে) তাদের কাজের পুরস্কার হিশেবে,
সেখানে তারা শুনবে না কোনো অসার অথবা পাপ-বাক্য
শুধু এই কথা ছাড়া—সালাম! সালাম!"[২২]

২২. সূরা ওয়াকিআ, ৫৬ : ১১-২৬।

কী চমৎকার, মন-মাতানো বর্ণনা, তাই না? যে মহাজাগতিক জীবনের সন্ধান আপনার রব আপনাকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, সেটা কোনো অনুর্বর বালুকাময় ভূমি নয়। সেটা এমন জায়গা যা তৈরি করা হয়েছে জগতের সকল সৌন্দর্য, কলা আর শিল্পের বহু উর্ধ্বে গিয়ে। সেই স্থানের সৌন্দর্যের বর্ণনা কোনো মানব-মন কল্পনা করতে পারে না। সেই সৌন্দর্যের ব্যাপারে বলতে গিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

'যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি, যে সম্পর্কে কোনো কান কখনো শুনেনি।'[২৩]

মুহূর্তের জন্য ধরে নিলাম আপনি সত্যিকার অর্থেই চাঁদে জমি কিনেছেন। যদি প্রশ্ন করি—চাঁদে গিয়ে থাকবেন কোথায়? বাড়ি বানাবেন কী দিয়ে? খাবেন কী? চাঁদের বাতাসে আপনাকে তো ভেসে থাকতে হবে সর্বদা। চোখ বন্ধ করে ভাবুন তো কেমন হবে আপনার সেই চন্দ্র-বিলাস? আমি জানি আপনি ভাবতেও ভয় পাচ্ছেন। মনে মনে বলছেন—'না বাবা! আমার জীর্ণ কুঠির, দুনিয়ার আলো-হাওয়া-জল আমার জন্য পরম নিয়ামত। আমি এখানেই বাঁচতে চাই।'

ডেনিস হোপ আপনাকে চাঁদের জমি দিতে পারলেও, বাঁচবার জীবনোপকরণ কোনোদিনই দিতে পারবে না। দুনিয়ার কেউই তা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না একমাত্র মহান রাব্বুল আলামীন ছাড়া। আপনি বলতে পারেন—'দুনিয়া থেকে স্পেসশীপে করে জীবনোপকরণ নিয়ে গেলেই তো হবে।' স্পেসশীপে করে দুনিয়া থেকে জীবনোপকরণ এনে চাঁদে বেঁচে থাকবার চেষ্টাটা অবান্তর বিলাসিতা, বাস্তবতা নয়।

কিন্তু যে মহাজাগতিক জীবনের দিকে আপনাকে আপনার রব ডেকে চলেছেন নিরন্তর, তাতে কী অসামান্য আয়োজন তিনি করে রেখেছেন দেখুন! যেন আপনি সেখানকার কোনো রাজকীয় অতিথি! সেখানে আপনাকে সাধারণ কোনো আসনে বসতে দেওয়া হবে না। আপনি বসবেন স্বর্ণ এবং তার চেয়েও মূল্যবান পাথর-খচিত আসনে। আপনার সেবার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চির-কিশোরের একটা দল তৈরি করে রাখবেন সেখানে। তারা সারাক্ষণ আপনার চারপাশে ঘুরঘুর করবে। তাদের হাতে থাকবে আপনাকে আপ্যায়নের যাবতীয় উপকরণ। আপনি যা খেতে চাইবেন, মুহূর্তে তারা সেটা নিয়ে হাজির

---

২৩. বুখারি, ৩২৪৪, ৪৭৭৯, ৭৪৯৮; মুসলিম, ২৮২৪; তিরমিযি, ২৫৩৯; আহমাদ, ৮৮২৭।

হয়ে যাবে। আপনার পছন্দের ফল, মিষ্টি, এমনকি যে পাখির গোশত খাওয়ার জন্য আপনার মন ব্যাকুল হয়ে উঠবে—মুহূর্তে সেটা সাজিয়ে নিয়ে হাজির হয়ে যাবে সেই কিশোরেরা। কোনো অপেক্ষা নেই, কোনো প্রতীক্ষা নেই।

শুধু কি তা-ই? আপনার সঙ্গী হবে জান্নাতের হূরেরা। আপনি যাতে একাকী অনুভব না করেন সেজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে সঙ্গী হিশেবে এ-সকল হূর দান করবেন। তারা হবে অত্যন্ত পবিত্রা, আয়তলোচনা। তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বর্ণনা করেছেন এভাবে—"যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তো।"

সেই মহাজাগতিক জান্নাতে কোনো অসার চিন্তা, কোনো অসার কথা, বেহুদা ভাবনা কিংবা কাজের খেয়াল আপনি পাবেন না। সেখানকার সবকিছুই শুদ্ধ আর পবিত্র। চারদিক থেকে আপনি কেবল শুনবেন এক মনোরম সঙ্গীতের সুর—সালাম! সালাম!

চাঁদে জমি কিনতে হলে ডেনিস হোপের অ্যাকাউন্টে আপনাকে পাঠাতে হবে বেশ অনেকগুলো টাকা। কিন্তু আপনার প্রতিপালক অনন্ত আবাসস্থল হিশেবে যে মহাজাগতিক জগৎ তৈরি করে রেখেছেন আপনার জন্য, তাতে জমি পেতে হলে আপনাকে গুনতে হবে না কোনো টাকা। কেবল জীবন আর জীবনের দর্শনটাকে যদি খানিকটা বদলে নেওয়া যায়, তাতেই সই।

ভাবছেন—কীভাবে বদলাতে হবে জীবন আর জীবনের দর্শন, তাই তো?

একেবারে সহজ। আপনাকে দাঁড়াতে হবে আপনার রবের সামনে। কোনো এক ভোরবেলা কিংবা উদাস দুপুরে এক কাপ চা অথবা কফি হাতে নিয়ে দূর-দিগ্বলয়-লীন নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকুন আপনার জীবনের উদ্দেশ্য কী, কেন সৃষ্টি করা হয়েছে আপনাকে। নিজেকে প্রশ্ন করুন—যেভাবে কাটছে আপনার নিত্যকার দিন, যেভাবে ফুরোচ্ছে হায়াতের সময়, আদৌ কি সেভাবে জীবন পার করার কথা? মৃত্যুর মতো এক অনিবার্য সত্যের দিকে দৌড়ে যাচ্ছেন আপনি—প্রতিদিন একটু একটু করে পৌঁছে যাচ্ছেন সেই অন্তিম মুহূর্তের আরও নিকটে। তবে মৃত্যুই কি আপনার জীবনের পরিসমাপ্তি? এর পর কি আরেকটা জীবন আপনার জন্য অপেক্ষা করে নেই, যে জীবন হবে অনন্ত অসীমের? যদি আপনার হৃদয় সায় দিয়ে বলে—'হ্যাঁ, সেই জীবন আমার জন্য অপেক্ষা

করে আছে', তাহলে আপনার আপন খেয়ালকে পরের প্রশ্ন করুন—সেই পরম বাস্তব জীবনের জন্য আপনার প্রস্তুতি কী?

জীবনের দর্শন বদলানো মানে হলো জীবনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে জায়গা দেওয়া। তাঁকে ভালোবাসা এবং ভয় করা। সাধারণত কাউকে ভয় পেলে আমরা তার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াই। দূরে দূরে থাকি। কিন্তু আল্লাহকে ভয় পাওয়াটা একেবারেই অন্য জিনিস! এই ভয় যতো বেশি প্রকট হয়, আমরা ততোই আল্লাহর কাছাকাছি চলে আসি।

আপনার রব চান যে আপনি যেন তাঁর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে চলেন। তার মানে এটা নয় যে আপনি তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াবেন। বরং—আপনি পালিয়ে বেড়াবেন সেই সকল কাজ থেকে, সেই সকল ঘটনা থেকে, সেই সকল বস্তু আর ব্যক্তি থেকে, যা আপনাকে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এই ভয় পাওয়ার অর্থ হলো—আপনি আলিঙ্গন করবেন সেই সকল জিনিস, সেই সকল ঘটনা, সেই সকল বস্তু আর ব্যক্তিকে, যা আপনাকে আপনার রবের আরও নিকটবর্তী করে।

সিরাতুল মুস্তাকীমের রাস্তা থেকে আপনাকে দূরে সরিয়ে দেয় এমন জিনিসগুলোকে যদি জীবন থেকে বাদ দিতে পারেন এবং আলিঙ্গন করতে পারেন সে সমস্ত জিনিসকে, যা আপনাকে নিকটবর্তী করে দেবে আপনার মহামহিম রবের, তাহলে আপনার জন্যই আল্লাহর ওয়াদা—'তারাই হবে নৈকট্যপ্রাপ্ত। সেখানে তারা থাকবে সুখময় জান্নাতে।'

৩

চাঁদের ভূমির যে ছবিগুলো ইন্টারনেটে দেখেছি, তাতে করে সেটাকে একটা মরা-মরুভূমির ভগ্নাংশ ব্যতীত বেশি কিছু মনে হয়নি। চাঁদে কোনো বাতাস নেই। বুঝতেই পারছেন—'দখিনা হাওয়া' নিয়ে কোনো ছন্দ আর কবিতা কিন্তু চাঁদের বাসিন্দারা লিখতে বা পড়তে পারবে না। দিনের বেলা চাঁদের ভূমি অসম্ভব গরম থাকে আর রাতের বেলা সেটা হয়ে পড়ে একেবারে হিমশীতল ঠান্ডা! এমন বিদঘুটে আবহাওয়ায় আর যা-ই হোক—সজ্ঞানে কোনো লোক থাকতে চাইবেন

বলে আমার বিশ্বাস হয় না। দুঃখিত—যেখানে অক্সিজেন-ই নেই, সেখানে থাকবার প্রশ্নটা বাতুলতা বৈকি!

আর যে মহাজাগতিক জগৎ আপনার জন্য তৈরি করে রেখেছেন মহান রব, তা এতো মনোহর, এতো মোহনীয় যে—আপনার ইচ্ছা হবে তার দিকে অনন্তকাল ধরে তাকিয়ে থাকতে।

পকেটের টাকা খরচা করে ডেনিস হোপের লুনার অ্যাম্বেসী থেকে আপনি কি এক টুকরো বায়বীয় বালির স্তূপ কিনবেন নাকি জীবনের দর্শন বদল করে আদায় করে নেবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টি—সেই সিদ্ধান্ত আপনার।

আকাশের খাতায় লেখা লজ্জার নাম

কুরআনে বর্ণিত দুটো নারী চরিত্র আমাকে বেশ মুগ্ধ করে। তাদের একজন হলেন সেই কন্যা, যার সাথে মাদইয়ানে মূসা আলাইহিস সালামের সাক্ষাৎ হয় এবং পরবর্তীতে তাদের বিয়েও হয়।

কন্যাদ্বয়ের সাথে মূসা আলাইহিস সালামের সাক্ষাৎটা বেশ কাকতালীয়। তাদের সাক্ষাতের সেই বর্ণনা সূরা কাসাসের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের বিস্তারিত জানিয়েছেন।

এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জেরে মূসা আলাইহিস সালামকে মাতৃভূমি ছেড়ে মাদইয়ানে পালিয়ে আসতে হয়। মাদইয়ানে এসে একটা গাছের নিচে বসে তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। একটু পর দেখতে পেলেন—অদূরে একটা কূপ থেকে কতিপয় লোক পানি উঠাচ্ছে আর তাদের দরকারি কাজ সেরে নিচ্ছে। তিনি আরও দেখলেন—কূপ থেকে একটু দূরে দুটো মেয়ে তাদের বকরিগুলোকে নিয়ে খুব জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কূপের দিকে এগুচ্ছে না।

কৌতূহলী হয়ে মূসা আলাইহিস সালাম তাদের জিগ্যেশ করে বসলেন কেন তারা তাদের বকরিকে পানি পান করাতে কূপের নিকটে যাচ্ছে না। মূসা আলাইহিস সালামের প্রশ্নের জবাবে মেয়েরা যা উত্তর দিয়েছিলো, তা কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্থান দিয়েছেন :

> لَا نَسْقِي حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ

> "আমরা (আমাদের বকরিগুলোকে) পানি পান করাতে পারি না, যতোক্ষণ না কূপের পাশে থাকা রাখালেরা তাদের পশুগুলো নিয়ে সরে যায়।"[২৪]

---

২৪. সূরা কাসাস, ২৮ : ২৩।

আধুনিক জামানা যেখানে নারীদেরকে পুরুষদের প্রতিযোগী বানাতে ব্যস্ত, যেখানে নারীদের শেখানো হচ্ছে—পুরুষের সমান হতে পারাটাই উন্নতি আর অগ্রগতির সারকথা, সেখানে কুরআন এমন দুটো মেয়েকে মঞ্চে উপস্থাপন করছে যারা কূপের দিকে পা বাড়াচ্ছে না কেবল এই কারণে যে—সেখানে পুরুষদের আনাগোনা আছে।

কেন পুরুষদের দেখে নারীদ্বয় সেদিন কূপের নিকটবর্তী হওয়া থেকে বিরত ছিলো? কারণ ওই পুরুষেরা তাদের বাবা নয়, ভাই নয়, নয় মাহরাম। এমতাবস্থায় একদল পুরুষের মাঝে দুটো নারীর উপস্থিতি ঘটলে সেখানে যে ফিতনা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা ছিলো, সেটাকে ভয় করেছিলো তারা। নারী এবং পুরুষের অবাধ মেলামেশায় ফিতনা আজকে নতুন করে তৈরি হচ্ছে না, এটা মানবজনমের সূচনালগ্ন থেকেই সমাজে বিদ্যমান। দুজন নারী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকর্ষিত হবে, পাশাপাশি থাকলে তাদের ভাবনার ডালপালা গজাবে—এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এই স্বাভাবিক ব্যাপারটা জীবনের স্বাভাবিকতার জন্য কোনোভাবেই স্বাভাবিক নয়। এভাবেই যদি চলতে দেওয়া হয়, সমাজ থেকে বিলুপ্ত হবে নৈতিকতা, ব্যভিচারে ভরে যাবে সমাজ আর রাষ্ট্র। যে সমাজ এমন স্বাভাবিকতাকে প্রশ্রয় দেয়, সেই সমাজ দিনশেষে আবর্জনার জঞ্জাল বৈ আর কিছু নয়। ঠিক এই কারণে—ইসলাম বিবাহের বিধান রেখেছে। তবে এটুকু করেই ইসলাম দায় সারেনি—নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকেও করেছে অনুৎসাহিত। নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্য সীমানা নির্ধারণ করেছে যে—কোন কোন নারী আর পুরুষের সামনে সে আসতে পারবে আর কার কার সামনে সে যেতে পারবে না। যেতে হলে কোন উপায়ে যেতে হবে তার উপায়ও বাতলে দিয়েছে।

মাদইয়ানের ওই নারীদ্বয় এই ফিতনাটাকে ভয় করেছিলো। তাকওয়ার পূর্ণ বিকাশ তাদের মধ্যে ঘটেছিলো বলেই সেদিন তারা কূপে থাকা পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতা করে বকরিগুলোকে পানি পান করানোর চাইতে দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করাটাকেই শ্রেয় মনে করেছে।

মেয়েদের গল্পটার সেখানেই সমাপ্তি ঘটেনি। গল্পের পরের অংশে দেখা যায়—বকরিদের পানি পান করানো নিয়ে মেয়ে দুটোর অসহায়ত্ব দেখে মূসা আলাইহিস সালাম নিজ উদ্যোগে তাদের বকরিগুলোকে কূপ থেকে পানি পান করান।

পানি পান করানো হলে সেগুলোকে মেয়েদের কাছে এনে ফেরত দেন এবং এরপর মেয়েরা বকরিগুলোকে নিয়ে ঘরে ফিরে যায়। খানিক বাদে মেয়েদের একজন পুনরায় মূসা আলাইহিস সালামের কাছে ফেরত আসে। মেয়ে দুটোর একজনের ফিরে আসার বর্ণনাটাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে তুলে ধরেছেন :

> فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا

> "অতঃপর নারীদ্বয়ের একজন সলজ্জ-পদে তাঁর (মূসা আলাইহিস সালামের) কাছে এসে বললো, 'আমার আব্বা আপনাকে ডাকছেন। আপনি আমাদের বকরিগুলোকে পানি খাইয়েছেন, তাই আব্বা আপনাকে এর বিনিময় দিতে চান।'"[২৫]

খুব বিস্ময়করভাবে এই আয়াতটায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মেয়েটির ফিরে আসাটাকে বর্ণনা করেছেন 'সলজ্জ-পদে' শব্দ দ্বারা। কুরআন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নাযিল করা সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ। এখানে এমন একটা শব্দ, এমন একটা অক্ষরও নেই যেটা অদরকারি, অপ্রয়োজনীয় কিংবা অতিরিক্ত। কুরআন যখন কোনো শব্দকে আলাদাভাবে ভাস্বর করে, সেটা তখন কোনোভাবেই কাকতালীয় নয়। তার পেছনে একটা গূঢ় রহস্য, একটা ভাবনার খোরাকি নিশ্চিত নিহিত রয়েছে।

ভাবুন তো—পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে শুরু করে ওই দিন পর্যন্ত কতো অসংখ্য-অগণিত ঘটনা ঘটেছে ইতিহাসে, তাই না? উত্থান হয়েছে কতো সভ্যতার, ধ্বংস হয়েছে কতো হাজারো সম্প্রদায়। ঢেউয়ের উত্থান আর পতনের মতো কতো অগণন ঘটনার সাক্ষী কালের সময়! কিন্তু কুরআন তার সবটাকে আমাদের সামনে বর্ণনা করেনি। এমন অনেক মহীয়ান সভ্যতা ছিলো, যারা আজ কালের ধুলোয় মিশে গেছে। এমন কতো তেজস্বী বীরপুরুষ বর্তমান ছিলো যারা ঘোড়া নিয়ে যখন ছুটতো, তখন আকাশ-বাতাস ধুলোতে মাখামাখি হয়ে যেতো। কিন্তু আজ কোথাও তাদের কোনো নাম নেই। কেউ তাদের স্মরণ করে না। কেউ জানে না তারা আদৌ কখনো পৃথিবীতে ছিলো কি ছিলো না। তাদের ক্ষমতা,

---

২৫. সূরা কাসাস, ২৮ : ২৫।

দম্ভ আর অহংকারের কথা পৃথিবী মনে রাখেনি।

অথচ দেখুন—একটা মেয়ে একজন পুরুষের সামনে যে সলজ্জ পদভারে এগিয়ে এসেছিলো, সেই কথা কুরআন আমাদের জানিয়ে দিয়েছে। মহীয়ান সব সভ্যতাকে পৃথিবী ভুলে গেলেও, অনেক তেজস্বী বীরের বীরত্বগাঁথা ইতিহাস থেকে বিলীন হলেও, একটা মেয়ের এতোটুকু লজ্জার কথা, লজ্জা-ভরে এগিয়ে আসার কথা কুরআন যুগ যুগ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করে ফেলেছে। প্রতিদিন, পৃথিবীর কোথাও না কোথাও, কেউ না কেউ মেয়েটার কথা পাঠ করছে। একটুখানি লজ্জা আর সম্ভ্রমকে কুরআন কী অপার মর্যাদায় অবিস্মরণীয় করে রেখে দিলো—ভাবুন!

আমাদের বোনেরা, যারা আল্লাহর বিধান পর্দাকে ভালোবেসে গ্রহণ করেছেন, যারা পর-পুরুষের দৃষ্টি হতে, তাদের সংস্পর্শ, সংস্রব হতে নিজেদের বিরত রেখেছেন, অতিশয় দরকার আর প্রয়োজন ব্যতীত যারা পর-পুরুষের সাথে কথা বলেন না, বলতে হলেও যারা শারীআহর সীমারেখার মধ্য থেকে, নিজের আব্রুকে হেফাযত করে কথা বলেন, তাদের জন্য সুসংবাদ। আপনাদের এই বেশ-ভূষা, এই চাল-চলন, এই লজ্জাটুকু আল্লাহ পছন্দ করেছেন। আপনারা সেই নারীদের উত্তরসূরী, যারা পর-পুরুষ আছে বলে সেদিন কূপে যাওয়া থেকে বিরত ছিলো। আপনারা সেই নারীর পদচিহ্ন অনুসরণকারী, যিনি মূসা আলাইহিস সালামের সাথে প্রয়োজনীয় কথাটা বলতে এসেও নিজের লজ্জাটুকু ধরে রাখতে ভুলে যাননি। সমাজ যতোই আপনাদের অন্ধকারের বাসিন্দা বলুক, আমরা তো জানি—প্রকৃত আলোর সন্ধানটা আপনারা পেয়ে গেছেন। আপনাদের অভিনন্দন!

ঝরা পাতার কাব্য

সূরা আল-আন'আমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

وَمَا تَسْقُطُ مِن وَّرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا

> "গাছ হতে এমন কোনো পাতা ঝরে পড়ে না, যার ব্যাপারে তিনি অবগত নন।"[২৬]

কুরআনের এই আয়াতটা চোখে পড়লেই আমি বিস্মিত হয়ে যাই। কী এক অসাধারণ একটা ব্যাপার ভাবুন তো! পৃথিবীতে গাছের সংখ্যা কতো তা যদি আপনাকে বের করতে বলা হয়, আপনার কি সাধ্য আছে তা বের করার?

ধরে নিলাম যে যাবতীয় 'হতে পারে/প্রায়/কাছাকাছি' জাতীয় কল্পনার আশ্রয় বাদ দিয়ে, এক অসাধ্য সাধন করে আপনি পৃথিবীর মোট গাছ সংখ্যা গুনে ফেললেন। কিন্তু সেসব গাছের পাতা সংখ্যা যদি আপনাকে গুনে বের করতে বলা হয়, তা কি আদৌ সম্ভব আপনার পক্ষে?

আপনি এবার হয়তো মাথা চুলকে বলবেন, 'তা কী করে হয়?'

তা আসলেই অসম্ভব। বলা হয়ে থাকে—আমাজন বনের মধ্যে এখনো এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে আজ অবধি কোনো মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি। চিন্তা করে দেখুন—এমনই এক দুর্গম অঞ্চলে, যেখানে সূর্যরশ্মি পৌঁছাতে হিমশিম খেয়ে যায়, মানবসভ্যতা এতোদূর এগুলো; কিন্তু যেখানে আজও পড়লো না কোনো জনমানবের পদচিহ্ন, এরকম একটা জায়গায় নীরবে-নিভৃতে, গভীর নিশিতে, অলক্ষ্য-অগোচরে যে পাতাটা ঝরে পড়ে, যে ঝরা পাতা কারও ঘুম

---

২৬. সূরা আনআম, ৬ : ৫৯।

বিনষ্ট করেনি, যার ঝরে পড়ার শব্দ টের পায়নি সেই গাছের ডালে বসে ঝিমুতে থাকা কোনো চড়ুই কিংবা টিয়ে পাখি, যার বিচ্যুতিতে দুনিয়ার কোথাও একবিন্দু হেরফের হয়নি, সেই ঝরা-পাতার খতিয়ান দুনিয়ার কোনো রেকর্ড-বইতে তোলা না হলেও এমন এক সত্তা আছেন, যিনি সেই অনুল্লেখযোগ্য ঝরা-পাতার ব্যাপারেও সমান সজাগ, সমান তদারককারী।

গভীর নিশিতে সবাই যখন নিশ্ছিদ্র নিরুপদ্রব ঘুমে বিভোর, হালকা মিহি বাতাসে ওই সময়ে গাছের যে ক্ষুদ্র পাতাটা বিচ্ছিন্ন হয় তার শেকড়ের বন্ধন থেকে, যে ব্যাপারে আপনি কোনোদিনও জানবেন না, সে ব্যাপারটার ব্যাপারেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অতি-অবশ্যই অবগত।

মহা জাগতিক দুনিয়ায় কতো কতো সৃষ্টি! কতো গ্যালাক্সি, মিল্কিওয়ে, কৃষ্ণগহ্বরের কতো রহস্য! কতো গ্রহ-উপগ্রহ, চাঁদ-তারা-সূর্য! এতো এতো সৃষ্টিরাজি গোটা মহাবিশ্বজুড়ে ছড়ানো-ছিটানো; কিন্তু তবুও—এতো সু-বিশাল এই সৃষ্টিরাজি নিয়ন্ত্রণের পরও, কোথায় কোন গহীন জঙ্গলে একটা ক্ষুদ্র পাতা ঝরে পড়ছে আর সেই ঝরা পাতার ব্যাপারেও তিনি বেখেয়াল নন—কতো অসাধারণ অভিভাবক আপনার রব ভাবুন তো!

গাছের একটা পাতা-ঝরার ব্যাপারকেও যিনি গুরুত্ব দেন, যিনি অতি-সামান্য, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারটার ব্যাপারেও খোঁজ নিতে ভোলেন না, কার্পণ্য করেন না, বেখবর হন না—আপনার কি ধারণা সেই রব আপনার দুঃখ-দুর্দশা, যে নিরন্তর ক্লান্তি, যে অপরিসীম বেদনার ভেতর দিয়ে আপনি যাচ্ছেন, তা সম্পর্কে জানেন না?

বেদনার ভারে আপনি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন, দুঃখের প্লাবনে যখন আপনি দুমড়েমুচড়ে যান, যখন নীরবে-নিভৃতে দুফোঁটা অশ্রু আপনার চোখ থেকে ঝরে পড়ে—নিশ্চিত থাকুন, সেই গভীর বনাঞ্চলের সুগভীর কোণে জন্ম নেওয়া সেই নাম না-জানা উদ্ভিদ, যার পাতা-ঝরার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বেখেয়াল নন, তিনি আপনার অশ্রু-ঝরার ব্যাপারেও সম্যক অবগত। তিনি আপনার দুঃখগুলো, যেগুলো আপনাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, সেগুলো সম্পর্কেও জানেন।

হতাশ হবেন না। আপনার রবের পরিকল্পনায় আস্থা রাখুন।

অন্তর বাঁচানোর মন্তর

সূরা ফালাক আর সূরা নাস আমাদের নিত্যদিন তিলাওয়াতের তালিকায় থাকা দুটো সূরা। আমরা সকাল-সন্ধ্যার আযকারে, সালাতের মধ্যে এই সূরা দুটো নিয়মিতভাবে তিলাওয়াত করি। আল-কুরআনুল কারীম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমাপ্ত করেছেন এই সূরা দুটো দিয়ে। সূরাগুলো নাযিলের প্রেক্ষাপটও অন্যান্য সূরাগুলোর তুলনায় একটু ভিন্নরকম।

মদীনায় একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাদু করা হয়। সেই জাদুর প্রভাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতো গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন যে—সাহাবারা পর্যন্ত ভয় পেয়ে যান। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেই জাদু-টোনা থেকে মুক্তির উপায় হিশেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই দুই সূরা নাযিল করেন এবং সূরা দুটো নাযিলের পরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণরূপে সেরে ওঠেন।

এই সূরা দুটোর মাঝে আছে অন্যরকম একটা গতি এবং মনে হয়—এই সূরা দুটো জীবনের সাথে যেন জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে।

সূরা ফালাক আর সূরা নাসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কয়েকটা গুণবাচক নামের মাধ্যমে তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন সূরা ফালাকের শুরুতে আছে—

> قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ①
>
> “বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঊষার রবের।”[২৭]

---

২৭. সূরা ফালাক, ১১৩ : ০১।

সূরা ফালাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একটা গুণবাচক নামের উল্লেখ করে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হলেও, সূরা নাসের শুরুতে তিনটা নামের উল্লেখ করে আমরা তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ إِلَٰهِ النَّاسِ ۝٣

"বলুন, আমি আশ্রয় চাইছি মানুষের প্রতিপালকের।

(আরও আশ্রয় চাইছি) মানুষের অধিপতির।

(এবং আরও আশ্রয় চাইছি) মানুষের ইলাহের।"[২৮]

দুই সূরার মাঝে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো এই—সূরা ফালাকের শুরুতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একটা গুণ—'রব্বিল ফালাক' তথা 'ঊষার রব' উল্লেখ করে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে তিন তিনটা বিষয় থেকে। সূরাটার দিকে তাকালেই আমরা সেটা বুঝতে পারব :

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝٣ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝٤ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝٥

"বলুন, আমি আশ্রয় চাইছি ঊষার রবের।

(আমি আশ্রয় চাইছি) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট হতে।

(আশ্রয় চাইছি) রাতের অনিষ্ট থেকে, যখন তা অন্ধকারে ছেয়ে যায়।

(আশ্রয় চাইছি) সেসব আত্মার অনিষ্ট থেকে, যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়।

(আর আশ্রয় চাইছি) হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।"[২৯]

সূরা ফালাকে আল্লাহর একটা গুণের উল্লেখ করে তিন তিনটা বিষয় থেকে আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করলেও, একেবারে উল্টো ব্যাপার ঘটেছে সূরা নাসের বেলায় এসে। এই সূরার একেবারে শুরুতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার তিন তিনটা গুণবাচক নাম আমরা উল্লেখ করি, কিন্তু আশ্রয় প্রার্থনা করি মাত্র একটা জিনিস থেকে। চলুন সূরাটার দিকে তাকাই :

---

২৮. সূরা নাস, ১১৪ : ১-৩।

২৯. সূরা ফালাক, ১১৩ : ১-৫।

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ إِلٰهِ النَّاسِ ۝٣ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝٤ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦

"বলুন, আমি আশ্রয় চাইছি মানুষের প্রতিপালকের।

(আরও আশ্রয় চাইছি) মানুষের অধিপতির।

(আরও আশ্রয় চাইছি) মানুষের ইলাহের।

আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তার অনিষ্ট থেকে, যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বারবার কুমন্ত্রণা দেয়।

যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে।

(এই কুমন্ত্রণাদাতা হচ্ছে) জিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।"[৩০]

ব্যাপারটা তাহলে কেমন দাঁড়ালো?

ধরুন একব্যক্তি আপনাকে তিনটা বিপদ থেকে বাঁচার জন্য একটা পরামর্শ দিলো এবং অন্য আরেকটা বিপদ থেকে বাঁচার জন্য দিলো তিনটা পরামর্শ। তাহলে বলুন তো—এই দুই বিপদের মধ্যে কোন বিপদ আপনার জন্য বেশি ভয়ানক?

একটা পরামর্শ মেনে যে তিনটা বিপদকে সামলানো যায় সেটা? নাকি তিনটা পরামর্শ দিয়ে যে একটাকে সামলানো লাগে, সেটা? কোনটার বেলাতে আপনাকে বেশি গলদঘর্ম হতে হবে?

নিশ্চয় দ্বিধাহীনভাবে আপনি বলবেন—দ্বিতীয় বিপদটাই এক্ষেত্রে বেশি ভয়ানক। কারণ সেটা থেকে বাঁচতে তিনটা পরামর্শ তথা কৌশলের দরকার পড়ে।

আপনি একদম ঠিক ভেবেছেন। দ্বিতীয় বিপদটা বেশি ভয়ানক বলেই সেটার জন্য দরকার পড়েছে বেশি পরামর্শ আর কৌশলের। প্রথম বিপদটা সে তুলনায় কম ভয়ের বলেই তার জন্য খুব বেশি পরামর্শ আর কৌশলের দরকার পড়েনি। বরং একটা কৌশল দিয়েই সামলানো যাচ্ছে সেরকম তিনটা বিপদ।

---

৩০. সূরা নাস, ১১৪ : ১-৬।

যদিও সূরা ফালাক আর নাসে যেসকল বিপদ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া হয়েছে, তার সব ক'টাই ভয়ানক এবং সর্বোচ্চ সতর্কতার দাবি রাখে, তথাপি সূরা ফালাকে বর্ণিত বিপদের চাইতে সূরা নাসে বর্ণিত বিপদটা অবশ্যই বেশি গুরুত্ব পাওয়ার দাবি রাখে। ঠিক এই কারণেই সূরা ফালাকে একবার আল্লাহর নাম নিয়ে তিনটা বিপদ থেকে পানাহ চাওয়া হলেও, সূরা নাসে তিনবার আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া হয়েছে মাত্র একটা বিপদ থেকে।

সূরা ফালাকে আমরা তাহলে কোন কোন বিপদ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই? সূরা ফালাকের শুরুতে আমরা আল্লাহর সৃষ্টিজগতের কতিপয় সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে পানাহ চাই। যদিও সেই অনিষ্টের প্রকার অনেক, তথাপি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নির্দিষ্ট তিন প্রকার অনিষ্টের উল্লেখ করে দিয়েছেন এই সূরাতে।

সেই অনিষ্টগুলো কী কী?

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝١

(আমি আশ্রয় চাইছি) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অসংখ্য-অগণিত উপকারী সৃষ্টিরাজি থাকলেও, তাঁর কিছু সৃষ্টি আছে যা অকল্যাণ সাধন করে। এগুলো সৃষ্টির পেছনে তাঁর অনেক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তবে সেই উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে একটা যে মানুষ এবং জিন জাতিকে পরীক্ষা করা সেটা নিঃসন্দেহ। এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমস্ত অকল্যাণকর সৃষ্টিরাজি থেকে আশ্রয় চাইবার কথা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। পরের আয়াতগুলোতে যদিও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সৃষ্টির সেই অকল্যাণগুলো থেকে নির্দিষ্ট তিনটিকে একে একে সামনে এনেছেন, তবে এই আয়াতে প্রথমেই সামগ্রিকভাবে অকল্যাণগুলোকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এরপর পরের আয়াতগুলোতে এসেছে সেই অকল্যাণ তিনটির বর্ণনা।

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝٢

রাতের অনিষ্ট থেকে, যখন তা অন্ধকারে ছেয়ে যায়।

তাফসীরকারকগণ বলেছেন—রাত্রিবেলা সাধারণত খারাপ জিন, ক্ষতিকর পোকামাকড়, হিংস্র পশু-প্রাণী এবং অপরাধপ্রবণ মানুষেরা বেশি চলাফেরা করে বিধায় এখানে সেসবের ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাওয়া হয়েছে। আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাওয়া হয়েছে যেন সেসবের হাত থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিরাপত্তা দান করেন।

> وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ④
>
> সেসব আত্মার অনিষ্ট থেকে, যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়।

সকল তাফসীরকারকের মতে, এখানে গ্রন্থিতে ফুৎকার দেওয়া বলতে জাদু-টোনা করাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এই কাজটাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর করা হয়েছিলো। জাদুকর, যারা কুফরি কালামের আশ্রয় নিয়ে জাদু করে, তারা ভয়ানক শির্‌ক আর কুফরের আশ্রয় নেয়। তাদের সে সমস্ত জাদু-টোনার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে এখানে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। কুফরি কালামের আশ্রয় যারা গ্রহণ করে, তারা ভয়ানক অপরাধ করে। তবে যাদের ওপর সেই জাদু-বিদ্যা প্রয়োগ করা হয়, অনেক সময় আক্রান্ত ব্যক্তি বুঝতেই পারে না যে তার বিরুদ্ধে এমন একটা ক্ষতিকর কাজ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আক্রান্ত ব্যক্তির বহুবিধ ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে। তাই এই জঘন্য এবং একইসাথে ভয়ংকর অপরাধের সাথে যারা জড়িত, তারা এবং তাদের সেই অশুভ বিদ্যার হাত থেকে বাঁচতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে।

> وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ⑤
>
> হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।

যে সমস্ত কারণে আত্মা কলুষিত হয়, হিংসা তার মধ্যে অন্যতম। হিংসার কারণে ধ্বংস হয়ে যায় মানুষের অনেক ভালো আমল। হিংসা অন্তরকে সংকুচিত করে। হিংসা থেকে বদ নজরের সৃষ্টি হয়। সাধারণত কেউ যখন জীবনে উন্নতি করে, কোনোকিছু অর্জন করে, অসাধারণ কোনো কর্ম সম্পাদন করে ফেলে, তার সেই কাজে মনে মনে অখুশি হওয়া, 'সে কেন এমন একটা ভালো জিনিস অর্জন করলো'—এই ভেবে মনে মনে পীড়িত হওয়াটাই হিংসার লক্ষণ।

হিংসাকে হাদীসে আগুনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আগুন যেভাবে কাঠকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়, হিংসুকের হিংসাও সেভাবে তার ভালো কাজ, ভালো আমলগুলোকে ধূলিসাৎ করে দেয়।[৩১]

হিংসার কারণে যদিও হিংসুটে ব্যক্তির মারাত্মক ক্ষতি হয়, তবে যাকে সে হিংসা করে, তারও মারাত্মক ক্ষতি হয়ে থাকে। কারণ—বদ নজর সত্য। বদ নজরের প্রভাবে ব্যক্তিজীবনে যেকোনো কেউ মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে পারে, সেটা আর্থিক, শারীরিক বা মানসিক—যেকোনোভাবে। বদ নজরের কারণে ব্যবসায়ে ক্ষতি হয়, সংসারে অশান্তি নামে, বাচ্চাদের স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা বাধাগ্রস্তসহ নানাবিধ অকল্যাণ ঘটতে পারে। তাই এই সূরাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হিংসুটে ব্যক্তির হিংসা থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার কথা বলেছেন।

সূরা ফালাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একটা গুণের উল্লেখ করে তিনটা ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে আমরা চলে যাই সূরা নাসে, যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার তিনটা গুণের উল্লেখ করে কেবল একটা ক্ষতি থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়।

কোন সেই ক্ষতি, তাহলে?

সূরা নাসে মূলত আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করি বিতাড়িত শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে। সেই সূরার মধ্যে আমরা বলি :

> مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
>
> "আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তার অনিষ্ট থেকে, যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বারবার কুমন্ত্রণা দেয়।
>
> যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে।
>
> (এই কুমন্ত্রণাদাতা হচ্ছে) জিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।"[৩২]

---

৩১. দেখুন—আবূ দাউদ, ৪৯০৩; ইবনু মাজাহ, ৪২১০; বাযযার, আল-মুসনাদ, ৬২১২; আবূ ইয়া'লা, আল-মুসনাদ, ৩৬৫৬।

৩২. সূরা নাস, ১১৪ : ৪-৬।

তাফসীরকারকদের মতে—'যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বারবার ওয়াসওয়াসা তথা মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়' বলতে এখানে বিতাড়িত শয়তানকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এই কুমন্ত্রণা জিনদের পক্ষ থেকেও যেমন হয়, তেমনিভাবে মানুষ নিজের ভেতর থেকেও পায়। নিজের ভেতর থেকে কীভাবে কুমন্ত্রণা পায় এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—নফসের তাড়নাই সেই কুমন্ত্রণা, যা মানুষকে পাপকাজে জড়িয়ে পড়তে প্রলুব্ধ করে তোলে।[৩৩]

সূরা ফালাকে রাতের অনিষ্ট, গ্রন্থিতে ফুৎকার দেওয়া জাদুকর আর হিংসুকের অনিষ্ট—তিনটা নির্দিষ্ট ক্ষতির উল্লেখ পাওয়া গেলেও, সূরা নাসে যে নির্দিষ্ট অনিষ্টের উল্লেখ আছে তা হলো—ওয়াসওয়াসা।

আল্লাহর একটা গুণের উল্লেখ করে সূরা ফালাকে তিনটা ক্ষতি থেকে বাঁচতে চাইলেও, সূরা নাসে আল্লাহর তিনটা নামের উল্লেখ করে আমরা কেবল একটা ক্ষতি থেকেই বাঁচতে চাই। সেটা হলো এই বিতাড়িত শয়তানের ওয়াসওয়াসা। আর এই ওয়াসওয়াসা শয়তান কোথায় দেয়? সোজা উত্তর—মানুষের অন্তরে।

সূরা ফালাকে যে ক্ষতিগুলোর বর্ণনা পাওয়া যায়, তার কোনোটাই কিন্তু অন্তরের ক্ষতি করে না। কিন্তু সূরা নাসে যে ক্ষতির বর্ণনা আছে তা সরাসরি অন্তরের সাথে যুক্ত। অর্থাৎ—শারীরিক ক্ষতির তুলনায় অন্তরের ক্ষতি হয়ে যাওয়াটা সবচাইতে বড় ক্ষতি। ঠিক এই কারণেই সূরা ফালাকে আল্লাহর একটা গুণের উল্লেখ করে তিনটা ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাওয়া হলেও, সূরা নাসে আল্লাহর তিনটা গুণের উল্লেখ করে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে মাত্র একটা ক্ষতি থেকে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটা হাদীসে পাওয়া যায়, তিনি বলেছেন, "মানুষের শরীরে এমন একটা বস্তু আছে, যেটা ভালো থাকলে সবকিছু ভালো থাকে, আর যেটা খারাপ থাকলে খারাপ থাকে সবকিছু। আর সেই বস্তুটা হলো কলব তথা অন্তর।"[৩৪]

অন্তরের ক্ষতিটাই সর্বদা বড় ক্ষতি। শয়তান যখন ওয়াসওয়াসা দেয়, তখন তা মূলত অন্তরেই দেয়। অন্তর কলুষিত হলে যাবতীয় কল্যাণ তার ওপর থেকে

---

৩৩. তাবারি, তাফসীর, ২৪/৭৫৫; ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৮/৫০৮; ওয়াহিদি, আত-তাফসীরুল বাসীত, ২৪/৪৭০-৪৭৩; কুরতুবি, তাফসীর, ২০/২৬১-২৬২; সুয়ূতি, আদ-দুররুল মানসূর, ৮/৬৯৪।

৩৪. বুখারি, ৫২; মুসলিম, ১৫৯৯; ইবনু মাজাহ, ৩৯৮৪; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৮৩৭৪।

তুলে নেওয়া হয়। অন্তরের অবস্থার ওপরেই নির্ভর করে একজন মানুষের ভালো থাকা আর খারাপ থাকা। কোনো মানুষ হিদায়াতের রাস্তা থেকে বিপথে চলে গেছে মানে হলো—তার অন্তর সেদিকে ঝুঁকে গেছে। কারও মাঝে মন্দ ভাব প্রকট হয়ে ওঠে মানে হলো—তার অন্তরে সমস্যা দেখা দিয়েছে। কেউ অশ্লীলতায় গা ভাসাচ্ছে, দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, নিজেকে হারিয়ে ফেলছে জাহিলিয়াতের অন্ধকারে; এসবকিছুর কারণ হলো এই—তার অন্তরে ব্যাধি বাসা বেঁধেছে। শয়তানের ওয়াসওয়াসার ধোঁকায় পড়েছে সে। শয়তান দখল করেছে তার অন্তর।

শুধু তা-ই নয়। অন্তরের অবস্থা স্বাভাবিক থাকলে, স্বাভাবিক থাকে মানুষের জীবন। অন্তরে সুকুন তথা শান্তি বজায় না থাকলে দ্বীন আর দুনিয়া—দুটোই বিষাক্ত লাগে। ইবাদাত-আমলেও মন বসে না। অস্থির অস্থির লাগে সবকিছু। কিন্তু শত প্রতিকূলতা, শত শঙ্কা আর জরা-জীর্ণতার মাঝেও যদি অন্তর শান্ত রাখা যায়, তাহলে সমস্ত ঝড়-ঝাপটাকে অনায়াসে সামলে নেওয়া সম্ভব হয়।

ঠিক এই কারণেই হয়তো সূরা ফালাকে আল্লাহর একটা গুণের উল্লেখ করে মোটাদাগে তিনটা ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইলেও, সূরা নাসে আল্লাহর তিনটা গুণের উল্লেখ করে আমরা আশ্রয় চাই একটা ক্ষতি থেকে। সূরা ফালাক শারীরিক ক্ষতি থেকে বাঁচার প্রার্থনা। সূরা নাসে আমরা প্রার্থনা করি অন্তরকে বাঁচানোর জন্য।[৩৫]

৩৫. মূলভাবটুকু শাইখ আবূ বকর আল-জাযায়িরির 'আইসারুত তাফাসীর, (৫/৬৩২)' থেকে নেওয়া।

এ-সময় শীঘ্রই ফুরিয়ে যাবে

১

একটা খুব মজার গল্প প্রচলিত আছে। এক রাজার খুব ঘনঘন মুড সুইং হয়। মানে—এই ভালো তো এই খারাপ। আর এই খারাপ তো এই ভালো। এই সমস্যার প্রতিকার-কল্পে তিনি নানান সমাধান খুঁজে বেড়াচ্ছেন কীভাবে তার এই অবস্থার পরিবর্তন করা যায়। রাজপ্রাসাদের সকল ফকির-কবিরাজ-ডাক্তার মিলে ব্যর্থ হলো রাজার এই অসুখ সারাতে। এতো পথ্য, এতো ঝাড়ফুঁক রাজার ওপরে প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু কিছুতেই রাজা উপকার পান না। অবস্থা যেন দিন দিন আরও বেগতিক হতে শুরু করে।

রাজ্যময় ঘোষণা করা হলো রাজার এই অসুখের কথা। আরও বলা হলো—রাজ্যের যে ব্যক্তি রাজার এই অসুখ সারানোর উপায় বাতলে দিতে পারবে, তাকে অঢেল ধনসম্পদ দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে।

অনেকে অনেকভাবে চেষ্টা করে দেখলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না যেন। এক টোটকা থেকে অন্য টোটকা, এক পথ্য থেকে অন্য পথ্য—এভাবে সকল উপায় প্রয়োগ করতে করতে সকলে যখন আশা ছেড়ে দেওয়ার উপক্রম, তখন কোত্থেকে যেন এক লোক এসে হাজির হলো। বেশ সাধারণ বেশভূষা লোকটার। তিনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন রাজপ্রাসাদে। হাতে একটা পাথর এবং তাতে যেন কিছু একটা লেখা। তাকে জিগ্যেশ করা হলো, 'এই পাথর দিয়ে কী হবে?'

তিনি বললেন, 'এই পাথর মহারাজের রোগ সারাবে।'

রোগ সারাবে বলেছেন বটে, কিন্তু কীভাবে এই পাথর রাজার রোগ উপশম করবে তা তিনি কাউকে বলতে রাজি নন। তার একটাই কথা—আমার যা বলার

আমি মহারাজকে বলতে চাই।'

শেষমেশ তাকে রাজার সামনে হাজির করা হলো। নিয়মতান্ত্রিক কুর্নিশ-পর্ব সেরে লোকটা বললেন, 'মহারাজ, আমার হাতে যে পাথরখানা দেখতে পাচ্ছেন, আশা করি এই পাথরখানাই আপনার রোগ মুক্তির উসিলা হিশেবে কাজ করবে। এই পাথরে এমন এক বাণী খোদাই করা আছে, যা আপনার সমস্ত মন খারাপের দিনে আপনাকে আনন্দের সংবাদ এনে দেবে এবং যখন আপনি আনন্দের আতিশয্যে বাস্তবতাকে বেমালুম ভুলে যেতে বসবেন, এই বাণী আপনাকে তখন টেনে বাস্তবতায় নিয়ে আসবে।'

রাজা তো বটেই, রাজসভার উজির-নাজির সকলেই তার কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক! কী এমন লেখা আছে ওই পাথরে, যা রাজার সকল সমস্যাকে এতো সহজে দূরীভূত করে দিতে পারে? যে সমস্যার সমাধান খুঁজতে খুঁজতে রাজ্যের পাইক-পেয়াদা থেকে শুরু করে উজির-নাজির সকলে ক্লান্ত-ঘর্মাক্ত, এই লোক সেই সমস্যার সমাধান হিশেবে কী এমন পরশ-পাথর নিয়ে এলো?

সেটা এক পরশ পাথর-ই বটে! তাতে যে কথাটা খোদাই করা ছিলো তা হলো—'এ-সময় শীঘ্রই ফুরিয়ে যাবে।'

কিন্তু রাজা কোনোভাবেই বুঝতে পারলেন না এই কথাটা কীভাবে তার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে। সেই জ্ঞানী লোকটাকে রাজা বললেন, 'তোমার কথা না-হয় বুঝলাম, কিন্তু পাথরে খোদাই করা এই বাণী কীভাবে আমার উপকারে আসবে তা তো বললে না।'

লোকটা মৃদু হেসে বললেন, 'মহারাজ, আপনি শুধু পাথরটাকে নিজের সাথে রাখবেন। যখন আপনার মানসিক বৈকল্য কিংবা আনন্দের আতিশয্যের পালা আরম্ভ হবে, তখন পাথরটায় একটু চোখ বুলিয়ে নিলেই হবে। বাকিটা আপনিই বুঝতে পারবেন।'

এর কিছুকাল পরে পার্শ্ববর্তী অন্য আরেক রাজার আক্রমণে বিধ্বস্ত হতে লাগলো পূর্বেকার সেই রাজার রাজ্য। মুহুর্মুহু আক্রমণে চারদিকে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা! পরিণতি এতোটাই শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে যে—রাজ্য হারানোটা রাজার জন্য সময়ের ব্যাপার মাত্র! যুদ্ধে রাজাও ভীষণভাবে আহত হলেন। উঠে দাঁড়ানোর

শক্তিটুকুও শরীরে মজুদ নেই। এমন বেগতিক অবস্থার মাঝে হঠাৎ একদিন রাজার মনে পড়লো সেই পাথরের কথা, যা তাকে একজন অপরিচিত লোক দিয়ে গিয়েছিলো। বলেছিলো—ভালো অথবা খারাপ, যে পরিস্থিতিই সামনে আসুক, ওই পাথরে চোখ বুলালে একটা সমাধান পাওয়া যাবে। লোকটার কথাটাকে বিশ্বাস করেছিলেন রাজা। সেদিন থেকে সাথে সাথে রাখছিলেন পাথরটাকে। যুদ্ধাহত শরীরে সেটা খুঁজে বের করে চোখের সামনে ধরলেন। গভীরভাবে দৃষ্টি দিলেন তিনি পাথরের মাঝে। খোদাই করা কথাটা জ্বলজ্বল করে উঠলো রাজার চোখের সামনে—'এ-সময় শীঘ্রই ফুরিয়ে যাবে।'

এই কথাটা যেন ভেতর থেকে টেনে তুললো রাজাকে। হারানো আত্মবিশ্বাস যেন মুহূর্তে ফিরে পেলেন তিনি। তিনি ভাবলেন, 'তাই তো! এই পরাজয় তো সাময়িক। এই পরাজয়ের শেষ আছে এবং শেষপ্রান্তে আছে আমার বিজয়ের সম্ভাবনা। এ-সময়, হ্যাঁ এ-সময় শীঘ্রই ফুরিয়ে যাবে।'

ভেঙে পড়া রাজার মনোবলকে এই কথাটা দারুণভাবে চাঙা করে তুললো। দমে যাওয়া শক্তিগুলোকে তিনি সাহসে পরিণত করার সংকল্প করলেন। আহত সৈনিকদের সেবা-যত্ন করে, নতুনভাবে সৈন্য-সামন্ত জোগাড় করে পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধে জড়ালেন রাজা এবং শেষপর্যন্ত বিজয় পুনরুদ্ধার করে তারপরেই ক্ষান্ত হলেন। পাথরে খোদাই করা সেই কথাটা তার জীবনে দারুণভাবে সত্য প্রমাণিত হলো। পরাজয়ের সেই সময়টা যে খুব সংক্ষিপ্ত এবং তা যে শীঘ্রই ফুরিয়ে যাবার ছিলো, তা রাজা হাতে-কলমে বুঝতে পারলেন।

এরপর বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন রাজা। রাজ্য পুনরুদ্ধারের খুশিতে তিনি গোটা রাজ্যময় উৎসবের আয়োজন করলেন। উৎসব, আনন্দ আর ফুর্তিতে কাটতে লাগলো রাজার দিনগুলো। আনন্দের আতিশয্যে মশগুল থাকা রাজা পূর্বেকার অবস্থায় ফিরে গেলেন দ্রুত। একদিন সেই পাথরের কথা খুব আচানকভাবে মনে পড়লো রাজার। সেই পাথর যা একদিন রাজাকে পরাজয়ের দ্বারপ্রান্ত থেকে বিজয়ের রাস্তা দেখিয়েছিলো। রাজা খুঁজে বের করলেন সেটা। চোখের সামনে তুলে ধরতেই সেই অমূল্য বাণী আবারও জ্বলজ্বল করে উঠলো তার সামনে—'এ-সময় শীঘ্রই ফুরিয়ে যাবে।'

কথাটা যেন রাজাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়ে গেলো। তিনি ভাবলেন,

'সত্যিই তো! যেকোনো মুহূর্তে আবারও আক্রমণের শিকার হতে পারি আমরা। হারাতে পারি রাজ্য আর রাজত্ব। আজ মহীয়ান সিংহাসনে বসে আছি, কাল তো আমাকে বনে-বাদাড়েও ঘুরে বেড়াতে হতে পারে। যে বিজয় নিয়ে আজ আমি উল্লসিত, যে বিজয় উদযাপনে আজ আমি বেপরোয়া, সে বিজয় যে কাল অবধি টিকবে—তার কী নিশ্চয়তা? সম্মুখেই হয়তো ওৎ পেতে আছে বড় কোনো পরাজয়। পরাজয়ের ছায়া মাথায় নিয়ে এই আনন্দ, এই উৎসব আর ফুর্তির কোনো কি মূল্য আছে?'

আনন্দের আতিশয্যে গা ভাসানো রাজার সংবিৎ ফিরলো। তিনি বুঝতে পারলেন জীবনের পরম এক বাস্তবতা—জীবনের কোনো অবস্থা-ই আদতে চিরস্থায়ী নয়।

২

গল্পের মূল বার্তাটার সাথে আমরা কেউই সম্ভবত দ্বিমত করবো না। জীবনের কোনো অবস্থা-ই যে আসলে চিরস্থায়ী হয় না—সে কথা আমাদের সকলের জানা। আমরা আমাদের জীবন থেকে এবং চারপাশের অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু উপলব্ধি করতে পারি যে—আমাদের সব দিন সর্বদা সমান কাটবে না। যে আছে সুখের চরম শিখরে, তারও আছে দুঃখের গহ্বরে তলিয়ে যাওয়ার ভয়। আবার দুঃখের গহনে যার নিত্য ওঠাবসা, হৃদয়ের কোথাও তারও আছে সুখী হওয়ার দারুণ স্বপ্ন। রাজারও থাকে রাজ্য হারানোর আশঙ্কা আর প্রজারও থাকে সম্রাট হয়ে ওঠার শখ। দিন আর রাতের মতো জীবনেরও উত্থান-পতন হয়। কেউ ভাঙে, কেউ-বা ফিরে পায় জীবনের কূল।

তবু—জীবনের এই পরম বাস্তবতা উপলব্ধি করেও আমাদের আয়োজনের কোথাও কোনো ব্যত্যয় ঘটে না। আমরা জীবন সাজাই, আবার সাজানো জীবন তছনছ হলে দুঃখে কাতর হয়ে পড়ি। জীবনের ভাঙা টুকরোগুলোকে জোড়া লাগাই। সেগুলো আবার ভাঙে, আবার আমরা পসরা সাজাই। এমন এক অনিবার্য জীবনের চক্রে আমরা জড়িয়ে থাকি, যার যবনিকা পতন ঘটে আমাদের মৃত্যুর দিন। যেদিন আমরা জীবনের পাঠ চুকিয়ে পাড়ি জমাই অনন্ত জগতে, সেদিন আমাদের সাজানো সংসার, সাজানো আয়োজন থেমে যায়।

অথবা—সেই সংসার, সেই আয়োজন থেকে আমিই বরং বাদ পড়ে যাই। আমার শূন্যস্থান দখল করে অন্য কেউ। আমার জীবনচক্রে তখন জড়িয়ে পড়ে অন্য কারও জীবন।

এই সুখ কিংবা এই দুঃখ—দুটোর কোনোটাই আমাদের জীবনে চিরস্থায়ী নয় জেনেও আমাদের সমস্ত মনোযোগ যেন এই জীবনকে ঘিরেই আবর্তিত। তবে যদি এমন হয়, আমরা যদি এমন এক জীবনের সন্ধান পাই যেখানে কোনো দুঃখ নেই, কোনো মন খারাপ নেই, নেই কোনো হৃদয় ভাঙার গোঙানি—তাহলে কেমন হবে? কেমন হবে যদি সেখানে বিরাজ করে কেবল অনাবিল আনন্দ, অবিরাম-অবিরত সুখ আর নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তির হাতছানি? যদি সেখানে কোনো দুঃখের ছোঁয়া না থাকে, যদি সেখানে না থাকে কোনো অশান্তি-অনিয়মের রেশ, কেমন হবে সেই স্বপ্নরাজ্য? এমন এক স্বপ্নরাজ্যের দেখা পেতে মানুষ কি মরিয়া হয়ে যাবে না? তার মন কি উতলা হবে না সেই জীবনের সন্ধান পেতে? যে পরম সুখের দেখা পেতে মানুষ জীবনভর সংগ্রাম করে, যদি তার সেই স্বপ্নের জীবনের সন্ধান কেউ তার সামনে মেলে ধরে, যদি তাকে বাতলে দেয় সেখানে যাওয়ার পথ, সে কি আনন্দের আতিশয্যে আত্মহারা হবে না?

সেটা এক স্বপ্নরাজ্যই বটে! আর সেই রাজ্যের সন্ধান আমাদেরকে মহান রব ছাড়া আর কে দিতে পারে?

জীবনের এই উত্থান-পতন জেনেও দুনিয়াকে ঘিরে আমাদের কতো কী আয়োজন! এই বাহারি আয়োজনের সবকিছু একদিন ফুরিয়ে যাবে অথবা সেগুলোকে ছেড়ে যেতে হবে জেনেও আমাদের বোধোদয় ঘটে না। চারপাশের সবকিছু নিশ্চিতরূপে ভঙ্গুর জেনেও আমরা এমনভাবে বাঁচি, যেন এসব আমাদের কোনোদিন ছাড়বে না অথবা আমরা ছেড়ে যাবো না এসবের কোনোকিছু। যে সাময়িক জীবনের সুখ-দুঃখ নিয়ে আমাদের এতো তুমুল আয়োজন, সেই অনন্ত সুখ রাজ্যের জন্য তাহলে আমাদের আয়োজনের মাত্রা কীরূপ হওয়া উচিত?

এই জীবনে যিনি সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তার জন্য আছে এক মহা-সুসংবাদ। সুসংবাদ তার জন্যও যিনি ছাড়তে চান না আয়েশী জীবন। দুঃখের ভারে নুইয়ে পড়েছে যার জীবন, জীবনের ক্লান্তি আর অবসাদে যে বিপন্ন-প্রায়—তাকেও জানাতে চাই এক মহা-সংবাদ! আপনার রব জানাচ্ছেন :

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝

"(আর) অবশ্যই আপনার জন্য আছে অফুরন্ত পুরস্কার।"[৩৬]

আয়াতের কথাটা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জান্নাতে যে অপরিসীম নিয়ামতের বন্দোবস্ত করে রেখেছেন, সেটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 'অফুরন্ত' বলতে আয়াতে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো غَيْرَ مَمْنُونٍ

'গাইরা মামনূন' বলতে এমন অবস্থাকে বোঝায়, যার কোনো সমাপ্তি নেই। এমন প্রতিদান যা দেওয়া শুরু হলে অনন্তকাল ধরে কেবল দিতেই থাকবে। যার মাঝখানে ক্ষণিক সময়েরও কোনো বিরতি নেই। সেটা এমন এক প্রস্রবণের মতো যার শুরু আছে, কিন্তু শেষ নেই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে—জান্নাতে তিনি বান্দাদের দান করবেন অফুরন্ত নিয়ামত। সেই নিয়ামত ফুরিয়ে যাওয়ার কোনো ভয় নেই। চুরি বা খোয়া যাওয়ার বিড়ম্বনাও সেখানে পোহাতে হবে না। বান্দা সেখানে পার করবে এক নিশ্চিন্ত, নির্ভাবনাময় সুখের জীবন। সেখানে তাকে মাসের বেতন নিয়ে টানাহ্যাঁচড়ায় পড়তে হবে না। চাকরির জন্য হাপিত্যেশ করা লাগবে না। সন্তানের ক্যারিয়ার নিয়ে পেরেশান হতে হবে না। সেখানে বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার ভয় নেই, ক্ষমতাবানের রক্তচক্ষু নেই, নেই সমাজের মাতব্বর আর মুরুব্বিদের কটু কথা শোনার বিপত্তিটুকুও। সেই জীবনে সমস্ত ক্লেদ-ক্লান্তি আর বিষাদের জ্বালা থেকে বান্দা মুক্ত। সমস্ত জড়তা-জীর্ণতা আর জিঘাংসার ছোবল হতে সে নিরাপদ। বান্দার জন্য সেখানে বন্দোবস্ত করা আছে এমন এক জীবন, যা তার অবচেতন মন সর্বদা কামনা করে। যে কল্পিত সুখের জীবন সে মনে মনে সাজায় প্রতিনিয়ত—জান্নাত তার চেয়েও বহু বহুগুণ সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে ঘেরা।

ভাবুন তো—কোনো এক চাকরি-প্রার্থীকে কেউ এসে বললো, 'অমুক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আপনি পেয়ে যাবেন আপনার কাঙ্ক্ষিত চাকরি। আর সেই চাকরিতে একবার ঢুকে যেতে পারলেই কেল্লাফতে! সেটা আর কোনোদিন হারানোর ভয় নেই।'

---

৩৬. সূরা কলম, ৬৮ : ০৩।

এমন লোভনীয় আশ্বাস যদি কোনো চাকরি-প্রার্থী পায় যার খুব করে একটা চাকরি দরকার যা একইসাথে চিরস্থায়িত্বের নিশ্চয়তাও দেবে—সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য চাকরি-প্রার্থীর চেষ্টা তখন কেমন হবে?

সংসারে শান্তি নেই এমন কাউকে যদি বলা হয়, 'আপনি যদি অমুক অমুক কাজ করেন, তাহলে আপনার সংসারে নেমে আসবে অনাবিল সুখ-শান্তি। ভয় পাওয়ারও কারণ নেই—সেই সুখ আর শান্তি একবার পেয়ে গেলে আর কোনোদিন হারাতে হবে না।

এমন আশ্বাসে সংসারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠা সেই মানুষটা কতোখানি আপ্লুত হবে আর সেই অফুরন্ত শান্তি লাভে কেমন মরিয়া হয়ে উঠবে, বলুন?

যার শরীরে মরণ-রোগের বাসা, তাকে যদি কেউ বলে, 'প্রতিদিন তিন মাইল হাঁটতে পারলে আপনার শরীর থেকে সমূলে দূর হবে এই ব্যাধি। আর কোনোদিন আপনি এই রোগে আক্রান্ত হবেন না।'

এমন ভরসা পেলে ভগ্ন শরীর নিয়েও ওই ব্যক্তি কি প্রতিদিন তিন মাইল হাঁটবে না?

তাহলে যেখানে চাকরি-প্রাপ্তির কোনো চিন্তা নেই, সংসারের অশান্তির কোনো কষ্ট নেই, নেই কোনো রোগ-শোকের প্রশ্ন—এমন এক স্বপ্নময় জীবনের প্রতিশ্রুতি যখন আপনার রব আপনাকে দেয়, সেই জীবনের জন্য আপনার তখন কেমন তাড়াহুড়ো থাকা উচিত? কেমন তৎপরতা আপনার থাকা দরকার সেই জীবনকে ঘিরে?

গল্পের রাজাকে গল্পের অপরিচিত সেই ব্যক্তি একটা কাল্পনিক পাথর দিয়েছিলো যাতে খোদাই করা ছিলো একটা কথা—'এ-সময় শীঘ্রই ফুরিয়ে যাবে।' দুনিয়ার জীবনের যা বাস্তবতা, তাতে পাথরে খোদাই করা সেই কথাটা একেবারে যুতসই। এখানে সুখ আর দুঃখ খুব ক্ষণস্থায়ী। আজকের রাজা আগামীকালের ফকির। আগামীকালের ফকির তারপরের দিনের রাজা হয়ে যায়। দুনিয়ার চক্রটাই এমন। দুনিয়ার বাস্তবতা এমন নিষ্ঠুর হলেও, আখিরাতের বাস্তবতা ঠিক তার উল্টো। সেখানে একবার যে রাজা, সে অনন্তকাল ধরে রাজা থাকবে। সেখানে একবার যে জিতে যাবে, আর কোনোদিন সে দেখবে না হারের মুখ। আর সেখানে

একবার যে হেরে যাবে—আহা! কী দুর্দশা যে হবে তার! সেখানে একবার হেরে গেলে জিতবার আর বিন্দু পরিমাণ সুযোগ অবশিষ্ট থাকবে না।

দুনিয়ার এই কষ্ট, ত্যাগ আর প্রতীক্ষার সময়গুলো একদিন ফুরিয়ে যাবে। মিলিয়ে যাবে সুখ আর শান্তির দিনগুলোও। কিন্তু আখিরাতের প্রাপ্তিগুলো অনন্তকালের।

فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

'তাদের জন্য আছে অফুরন্ত প্রতিদান।'[৩৭]

সেই অফুরন্ত নিয়ামত পাওয়ার জন্য, সেই অনন্ত অনাবিল সুখের সাগরে অবগাহনের জন্য হবে কি আমাদের একটু সময়? একটু সময় আমাদের রবের জন্য?

৩৭. সূরা তীন, ৯৫ : ০৬।

অন্তরের ব্যাকরণ

মানুষ বড় প্রকাশোন্মুখ জীব। সে যখন বড় এবং অসাধারণ কিছু করে, তার অন্তরে তখন স্বীকৃতির সাধ কিলবিল করে ওঠে। সে স্বীকৃতি চায় এবং স্বীকৃতি পেতে সে বড় পছন্দ করে।

জীবনের বড় ঘটনাগুলোতে আশপাশের সকলের স্বীকৃতি পেতে মানুষ মরিয়া হয়ে থাকে। সে যখন ব্যবসায়ে খুব উন্নতি করে, সে চায় আশপাশের সকলে তাকে বড় এবং নামকরা ব্যবসায়ী হিশেবে চিনুক। যখন ভালো বেতনের চাকরি পায়, চারপাশের মানুষের কাছ থেকে মেধা এবং পরিশ্রমের প্রশংসা শুনতে সে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। যখন সে বড় বাড়ির মালিক হয়, যখন তার গাড়ি হয়, ক্ষমতা হয়, নামডাক হয়—এসবকিছুর স্বীকৃতি লাভের জন্য তার অন্তরে তখন একটা তাড়না কাজ করে।

কুরআনের পাতায় পাতায় নবিদের অনেকগুলো দুআর দেখা মিলে। আমি মাঝে মাঝে ভাবি—নবি-রাসূলদের দুআগুলোকে এতো গুরুত্ব সহকারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে স্থান দিয়েছেন এবং সেগুলোকে বারংবার আমাদের সামনে হাজির করেছেন, এর পেছনে কোন মাহাত্ম্য থাকতে পারে?

এই জিজ্ঞাসার জবাব আমি পেয়েছিলাম আমার জীবন থেকে। আমি যখন আমার জীবনের পেছনে তাকাতে লাগলাম, আমি অবাক বিস্ময়ে খেয়াল করলাম—

কখন অনুনয়-বিনয় করে, কাতর গলায় আল্লাহর কাছে দুআ করেছি, তা মনে করতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। শেষ কবে যে দুহাত তুলে আল্লাহর কাছে বড় দরদ দিয়ে কিছু চেয়েছি আমি মনে করতে পারি না। এমন নয় যে আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নেওয়ার মতো কিছুই আমার জীবনে নেই। আল্লাহর কাছে হাত পাতবার অনেক উপলক্ষই জীবনে নানান সময় হাজির হয়, কিন্তু আমি দুর্ভাগা সেই সময়গুলোকে অনর্থক চিন্তা, পেরেশানি আর দুর্ভাবনায় অপচয় করি। যিনি আমাকে সাহায্য করবার জন্য উন্মুখ, তার দুয়ারে হাত পাততেই আমি রোজ রোজ ভুলে যাই।

দুআর মতো এতো বড় এক সুযোগকে আমরা যে হেলায় হারাই, এটা যাতে আমরা না করি, সেজন্যই নবিদের দুআগুলোকে এতো গুরুত্ব সহকারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হাজির করেছেন বলেই আমার ধারণা। আমরা যাতে অনুধাবন করতে পারি যে—আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা হওয়ার পরেও, নুবুওয়াতের মতো সম্মাননা পাওয়ার পরেও যদি তারা দুআ করতে না ভোলেন, তাহলে আমার মতো অধমের তো সিজদাহ থেকে মাথা তোলাই উচিত নয়।

৩

কুরআনের দুআগুলো আমাকে বেশ আশ্চর্যান্বিত করে। যেন সেগুলো তাকওয়া, তাওয়াক্কুল আর ঈমানের জোয়ারে টইটম্বুর। ঠিক এমনই একটা দুআর দেখা মিলে সূরা আল-বাকারায়, যা আল্লাহর কাছে করেছিলেন আমাদের পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। পুত্র ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে যখন তিনি কা'বার ভিত্তিপ্রস্তর পুনরায় স্থাপন করলেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনি এই দুআটা করেন।

দুআটার ভেতরে যাওয়ার আগে আমি আপনাদের একটা দৃশ্যের সামনে দাঁড় করাতে চাই। ধরা যাক বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী শাসকের পক্ষ থেকে আপনাকে একটা কাজ দেওয়া হলো। কাজটা হলো—তারা নির্মাণ করবে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় দালান, যা হার মানাবে বুর্জ আল-খলিফাকেও! মহা এই কাজের দায়িত্ব দুনিয়ার আর কেউ নয়, পেয়ে গেছেন আপনি!

এমন একটা কাজের মহা-দায়িত্ব যদি আপনি আজ রাতে পেয়ে যান, ভাবুন তো

আপনার চারপাশে কেমন হইচই পড়ে যাবে? আপনার ফেইসবুক-ইন্সটাগ্রাম-টুইটারসহ সকল সোশ্যাল মিডিয়ায় কী অভাবনীয় কাণ্ড ঘটবে, তা কি আপনি ভাবতে পারেন? এই ঘটনা যখন আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় জানাবেন, তখন লাখ লাখ মানুষ আপনাকে অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা জানাবে। রাতারাতি আপনি হয়ে যাবেন মহা-সুপারস্টার! আপনার পা তখন আর মাটিতে থাকবে না।

এমনই এক মেগা-প্রজেক্টের দায়িত্ব পেয়েছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। প্রায়-বিলীন হয়ে যাওয়া পৃথিবীর সর্বপ্রথম গৃহ কা'বাকে পুনরায় নির্মাণের এক মহা-দায়িত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অর্পণ করেছেন তাঁর ওপর। সেই দায়িত্বে যখন তিনি হাত লাগালেন, তখন নিজের পুত্রকে সাথে নিয়ে তিনি আল্লাহর কাছে হাত তুলে বললেন :

> رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾
>
> "হে আমাদের প্রতিপালক! (এই কাজটাকে) আপনি আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ।"[৩৮]

পৃথিবীর সবচেয়ে হাই-রাইজ বিল্ডিংয়ের ভিত্তিপ্রস্তর যখন স্থাপন করতে যাবেন, তখন নিশ্চয় মুহুর্মুহু ক্যামেরার ক্লিকে বন্দী হয়ে পড়বেন আপনি। সেলফিতে, ফটোতে, ভিডিওতে দুনিয়ার সকলকে জানাতে আপনি মরিয়া হয়ে উঠবেন যে—কী বিরল সম্মানের অধিকারী আপনি হয়েছেন!

আপনি লিখবেন—'Yes, I've done it!

পত্রিকাগুলো আপনাকে নিয়ে ফিচার ছাপবে, চ্যানেলগুলো আপনাকে নিয়ে সিরিজ-প্রোগ্রামের আয়োজন করবে। সবকিছুকে ঘিরে আপনার তখন সে কী উন্মাদনা!

কিন্তু কা'বা, যেটা দুনিয়ার সবচাইতে সম্মানিত এবং পবিত্র ইবাদাত-গৃহ, সেই গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দায়িত্ব পেয়ে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম উন্মত্ত উল্লাসে ফেটে পড়েননি। তিনি মক্কা থেকে গিয়ে তাঁর কওমকে জানাননি যে—'জানো, আমি কিন্তু কা'বা গৃহ নির্মাণের দায়িত্ব পেয়েছি! কা'বা গৃহ কি

---

৩৮. সূরা বাকারা, ২ : ১২৭।

তোমরা জানো? সেটা হলো আল্লাহর পবিত্র ঘর! দুনিয়ার বুকে নির্মিত সর্বপ্রথম ইবাদাত-গৃহ!'

এমন সম্মানের অধিকারী হয়ে তিনি মাস-ব্যাপী মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজনে মত্ত হয়ে যাননি। তিনি দুনিয়া-ব্যাপী ঘোষণা দেননি তার অর্জনের। বরং দায়িত্বটা পেয়ে তিনি আল্লাহর কাছে হাত তুলে বললেন যেন মহামহিম রব তাঁর কাজটাকে কবুল করে নেন।

কিন্তু এখানে কবুল করার প্রশ্নটা এলো কেন? এই কাজের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই তো ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে মনোনীত করেছেন। এই দায়িত্ব আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাঁর ওপর অর্পণ করেছেন। তিনি যদি তাঁকে যোগ্য মনে না-ই করতেন, তাহলে দায়িত্বটা তো তাঁকে দিতেন না। তবে কেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কাজটা করতে গিয়ে অনুনয়-বিনয় করে, কাতর গলায় বললেন—'আল্লাহ, আমাদের পক্ষ থেকে কাজটাকে আপনি কবুল করে নিন'?

এটাই হচ্ছে বিনয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ক্ষমতার প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম খুব ভালো করেই জানেন যে—আল্লাহর সাহায্য আর দয়া না থাকলে এই কাজ তিনি কোনোদিনও সমাপ্ত করতে পারবেন না। এই কাজ করার যে যোগ্যতা তাঁর মাঝে আছে, তার পুরোটাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রদত্ত। তিনি নিজ থেকে কোনোকিছুই করার ক্ষমতা রাখেন না। এবং যেহেতু তিনি মানুষ, তাই কাজটা করতে গিয়ে তাঁর ভুলত্রুটি হতে পারে। সমস্ত ত্রুটিকে, সমস্ত ভুলকে ক্ষমা করে দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন তার কাজটাকে কবুল করেন এটাই তাঁর আর্জি।

যে শাসক আপনাকে দুনিয়ার সবচেয়ে উঁচু দালান নির্মাণের দায়িত্ব দেন, তার সামনে গিয়ে আপনি কি এটা কখনোই বলবেন যে—'আপনার কাজটা করতে গিয়ে আমার খানিকটা এদিক-সেদিকও হতে পারে। আপনাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাজ বুঝিয়ে দিতে পারবো—এমন কোনো কথা নেই কিন্তু।'

আপনি এভাবে বলেন না। আপনি জানেন এভাবে বলতে গেলে দুনিয়ার মানুষেরা

আপনার দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠাবে। তাদের মনে সন্দেহ দানা বাঁধবে আপনার যোগ্যতা নিয়ে। তাদের সামনে আপনাকে থাকতে হয় প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী। আপনাকে বলতে হয়—'এই টাইপ কাজ তো আমি কতো অনায়াসেই করে ফেলি। আমার অমুক প্রজেক্ট দেখেন, তমুক প্রজেক্টের ব্যাপারে খোঁজ নেন দরকারে।'

বসের কাছে নিজের এক্সেলেন্স প্রমাণে আপনি তখন মরিয়া হয়ে উঠবেন।

কোনো কাজ শুরুর পূর্বে অথবা শুরু করতে গিয়েই যদি আপনি নিজের পক্ষ থেকে সামান্য ত্রুটির আশঙ্কাও প্রকাশ করে ফেলেন, দুনিয়ার কোনো বস-ই সেটাকে ভালোভাবে গ্রহণ করবে না। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে ব্যাপারটা পুরোপুরিই অন্যরকম। আপনার সমস্ত অক্ষমতা, অদক্ষতা, অপারগতা আর কেউ জানুক বা না-জানুক, আল্লাহর কাছে তা কি আদৌ কোনোভাবে গোপন থাকে? তিনি অবশ্যই জানেন যে আপনার আসলে বড়াই করার মতো কোনো যোগ্যতা নেই। আপনি যেটাকে নিজের 'যোগ্যতা' ভাবেন, তা আসলে আল্লাহর 'দয়া'। তিনি দয়া করেন বলেই আপনি কাজটা ভালো পারেন।

আল্লাহর এই অনুগ্রহকে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম অনুভব করেছিলেন বলেই পবিত্র কা'বা ঘর নির্মাণের দায়িত্ব পেয়েও তিনি অহংকারে ফেটে পড়ার বদলে বিনয়াবনত হয়েছিলেন। ওই একই দুআয় তিনি বলেছিলেন—'নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'

বান্দার সকল কাজে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যে নিরন্তর তদারকি, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনো বিষয়ই যে আল্লাহর কাছে গোপন করা যায় না, এতো বড় সম্মানের অধিকারী হওয়ার পরেও ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর এই গুণের কথা ভুলে বসেননি। কোনো কাজে আপনি কতোটুকু হেলাফেলা করেন তা কেবল নয়, হেলাফেলা করার ভাবনা যখন আপনার অন্তরে উদয় হয়, ওই ভাবনাটাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে গোপন থাকে না।

আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি—স্বীকৃতি লাভের পর আনন্দের আতিশয্যে যেখানে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে, সেখানে নবি-রাসূলগণ কী সুন্দর সংযম আর বিনয়ের দীক্ষাই না আমাদের দিয়ে গেলেন!

৪

এই দুআর মধ্যে আরেকটা জিনিস বেশ লক্ষণীয়। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর সেই দুআয় বললেন:

"হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে (এই কাজটাকে) আপনি কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সবকিছু শোনেন আর সবকিছু জানেন।"

আল্লাহর নির্দেশে কা'বা ঘরের হয়তো একটা দেয়াল নির্মাণ করেছেন, অথবা কিছু পাথরকে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে কা'বা পুনঃনির্মাণের কাজটা শুরু করেছেন। কাজটা শুরু করেই তারা আল্লাহর কাছে হাত তুলে দুআ করেছেন সবার আগে।

যে কাজটা তাঁরা করেছেন, সেটা পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা এবং মর্যাদাপূর্ণ একটা কাজ নিঃসন্দেহে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদিও সবকিছু দেখেন, কিন্তু অতি আশ্চর্যজনকভাবে ওই দুআর মধ্যে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলেননি যে—

'আমাদের রব! এই কাজটাকে আপনি আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সবকিছু দেখেন।'

তাঁরা যেটা করেছেন, সেটা তো দেখানোর মতোই একটা কাজ, তাই না? প্রকাশ্য দিবালোকেই তাঁরা কাজটা সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু দুআটার মধ্যে আল্লাহর গুণবাচক 'আস-সামী' (যিনি সবকিছু শোনেন) এবং 'আল-আলীম' (যিনি সবকিছু জানেন) নাম দুটো ইবরাহীম আলাইহিস সালাম উল্লেখ করলেও, আল্লাহর গুণবাচক নাম 'আল-বাসীর' (যিনি সবকিছু দেখেন) নামটা তিনি উল্লেখ করেননি।

কেন তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার 'আল-বাসীর' নামটাকে বাদ দিয়ে 'আস-সামী' এবং 'আল-আলীম' নাম দুটোকে মোটাদাগে উল্লেখ করলেন, ভাবুন তো?

আমার মনে হয়—এখানে আমাদের জন্য একটা জিনিস শেখার আছে।

যা দেখা যায়, তা সবসময় সত্য নয়। যা দেখা যায় তার বাইরেও অনেককিছু থেকে যায়, যা আদতে দেখা যায় না।

আপনার পাড়ার চৌধুরি সাহেব পাঁচ লক্ষ টাকা দামের গরু কিনে কুরবানি দিচ্ছে। এই ঘটনায় আপনি যা দেখতে পাচ্ছেন তা হলো—চৌধুরি সাহেবের দিলটা অনেক বড়! এতো বড় গরু কিনে কুরবানি দেওয়ার জন্য তো ওরকম একটা কলিজাও থাকা লাগে, তাই না?

কিন্তু এই ঘটনার পেছনের যে জিনিসটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, তা হলো এই—চৌধুরি সাহেবের ইখলাস আদতে কতোখানি নির্ভেজাল। তিনি কি লোকেদের বাহবা কুড়ানোর জন্য, মহল্লায় নিজের বড়লোকি প্রমাণের জন্য এতো বড় গরু দিয়ে কুরবানি দিচ্ছেন, নাকি সত্যি সত্যিই আল্লাহকে রাজি-খুশি করাই তার উদ্দেশ্য। তার আয়-উপার্জন কতোখানি হালাল আর কতোখানি হারাম—সেইটাও অনেক সময় আপনি দেখতে পান না।

বি-শা-ল দামের পশু কিনে কুরবানি দেওয়ার এই যে ঘটনা আপনি দেখতে পাচ্ছেন—এটা কিন্তু আসল দৃশ্যপট নয়। আসল দৃশ্যপট দেখা আপনার পক্ষে কখনো সম্ভবও নয়। তাহলে কে দেখতে পায় আসল দৃশ্যপট?

কেবল তিনিই আসল দৃশ্যপট দেখতে পান, যিনি গোপন আর প্রকাশ্য—সবকিছু শোনেন আর সবকিছু জানেন। অন্তর যা ধারণ আর লালন করে কিন্তু প্রকাশ করে না, প্রদর্শন করে না, বলে বেড়ায় না—সেসবও তাঁর কাছে গোপন থাকে না। হারাম উপার্জনের যে টাকাটা হাত স্পর্শ করা ছাড়াই ব্যাংকে জমা হয়ে যায়, যে ঘটনা সম্পর্কে দুনিয়ার কেউ কোনোদিন জানবে না বলে আপনি বিশ্বাস করেন—আসমানের অধিপতির কাছে সেটা কখনোই অজানা নয়।

পাঁচ লাখ টাকা দামের গরু কিনে চৌধুরি সাহেব বড়লোক সাজতে চান নাকি সত্যি সত্যিই তার উদ্দেশ্য সৎ আর ইখলাস নির্ভেজাল—সেই ঘটনা কেবল জানেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। কারণ চৌধুরি সাহেবের অন্তরে কী বাজছে, তা তিনি শুনতে পান যদিও তা মুখ দিয়ে বেরোয় না। চৌধুরি সাহেবের অন্তর কী পোষণ করছে, তা তিনি জানেন যদিও চৌধুরি সাহেব সেটা কাজে প্রকাশ করে না। যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 'আস-সামী' তথা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবকিছু শোনেন এবং 'আল-আলীম' তথা সবকিছু জানেন,

তাই তাঁর কাছ থেকে আসলে কোনোকিছুই গোপন করা যায় না।

চোখে যা দেখা যায়, তা সর্বদাই সত্য নয়। তাই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এই দুআর মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এমন দুটো নাম ধরে দুআ করেছেন, যে নাম দুটো প্রকাশ করে দেয় মূল ঘটনার আদ্যোপান্ত। যে নাম দুটো তুলে আনে ঘটনার পেছনের ঘটনা। যে নাম দুটো অন্তরের গভীরে প্রোথিত ভাবনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভগ্নাংশকেও জেনে ফেলে অনায়েসে।

দুআটার মধ্যে তিনি বলেননি—আমার রব! এই কাজ আমি সম্পন্ন করেছি। আপনি তো সবকিছু দেখেন। এখন আপনি কাজটাকে কবুল করুন।

বরং তিনি বলেছেন—আমার রব, কাজটা আমি সম্পন্ন করেছি। এই কাজ কী উদ্দেশ্যে, কার উদ্দেশ্যে আমি করেছি তা আপনার অজানা নয়। নিশ্চয় আপনি সব শোনেন আর সব জানেন। আমার কাজটাকে আপনি কবুল করুন।

দুআর এই ছোট্ট অংশেও ইবরাহীম আলাইহিস সালাম রিয়া তথা প্রদর্শনেচ্ছাকে এড়িয়ে গিয়ে অন্তরের অবস্থাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি জানেন অন্তরের ব্যাকরণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে গোপন করা যায় না। এই দুআর মাধ্যমে তিনি যেন আমাদের শিখিয়ে গেলেন—জীবনে আমরা যা-ই করি না কেন, ইখলাস তথা কাজটা কার সন্তুষ্টির জন্য করছি সেটাই প্রথম এবং শেষ কথা।

আল্লাহকে যারা পাইতে চায়

১

মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এমন একজন নবি, যার জীবন থেকে আমরা কুড়িয়ে নিতে পারি নিজেদের জীবনের জন্য অনেক অনেক পাঠ। মাদইয়ানে মূসা আলাইহিস সালামের আগমন, গাছের নিচে বসে জিরিয়ে নেওয়া এবং দুজন নারীর বকরিকে পানি পান করানোর ঘটনাটা ইতোমধ্যেই আমরা আলোচনা করেছি। সেখান থেকে আরেকটা জীবন দর্শন কুড়িয়ে আনতে সেই ঘটনাতে আমরা সংক্ষিপ্তাকারে আরেকবার চোখ বুলাবো।

দুজন নারী একটা কূপ থেকে নিজেদের বকরিকে পানি পান করাতে এসেছিলো। কূপের কাছে এসে তারা দেখলো—অনেকগুলো পুরুষ মানুষ কূপ থেকে পানি উঠাচ্ছে নিজ নিজ প্রয়োজনে। যেহেতু কূপের কাছে অনেকগুলো পুরুষ মানুষের আনাগোনা, তাই রমণীদ্বয় কূপের কাছে না গিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করাটাকেই শ্রেয় মনে করলো। পুরুষেরা চলে গেলেই কেবল কূপের কাছে যাবে—এমনটাই তাদের সিদ্ধান্ত।

সময় গড়িয়ে যায়, কিন্তু কূপের পাড় থেকে পুরুষদের উপস্থিতি কমে না। ওদিকে নারীদের ঘরে আছেন তাদের বৃদ্ধ পিতা, যিনি উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছেন নিজ কন্যাদের ঘরে ফিরে আসার। একদিকে বৃদ্ধ পিতাকে দেখভালের জন্য ঘরে ফিরবার তাড়া, অন্যদিকে পুরুষদের আনাগোনার কারণে কূপের কাছে যেতে না পারা—নারীদ্বয়ের জন্য ব্যাপারটা তখন খানিকটা বিপত্তির-ই বটে।

মূসা আলাইহিস সালাম কাছাকাছি কোনো এক গাছের ছায়ার নিচে বসে বিশ্রাম করছিলেন। নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে সেদিনই তিনি দূর পরবাসের মাদইয়ানে পা

রেখেছেন। চেনেন না এখানকার কোনো জনপদ, পরিচিত নন কোনো কৃষ্টি-কালচারের সাথেও।

নারীদ্বয়ের বিপত্তিটা চোখ এড়ালো না মূসা আলাইহিস সালামের। বেশ অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকা এবং কূপের কাছে ঘেঁষতে না পারার কারণটা বুঝতে পারলেন তিনি। স্থির করলেন—রমণীদ্বয়ের বকরিগুলোকে তিনি নিজ দায়িত্বে পানি খাইয়ে আনবেন। এতে করে তাদেরকে পুরুষদের মাঝে আসতে হবে না এবং দূরে দাঁড়িয়ে গুনতে হবে না অপেক্ষার প্রহরও।

মূসা আলাইহিস সালাম তাদের বকরিগুলোকে নিজ দায়িত্বে পানি খাইয়ে আনলেন। তারপরের ঘটনাটুকুও আমাদের জানা—একজন অপরিচিত লোক তাদেরকে সাহায্য করেছে সেই গল্প মেয়েরা তাদের বৃদ্ধ বাবার কাছে করতে ভোলেনি। সবকিছু শুনে মেয়েদের বাবাও খুশি হলেন এবং এমন পরোপকারী আল্লাহর বান্দাকে তিনি পুরস্কৃত করতে চাইলেন। মেয়েদের একজনকে পাঠিয়ে তিনি ডেকে পাঠালেন মূসা আলাইহিস সালামকে।

মূসা আলাইহিস সালাম তাদের বাড়িতে উপস্থিত হওয়ার পর মেয়েদের একজন তাদের পিতাকে বললেন,

> يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۝
>
> "বাবা, আপনি বরং এই লোককে কাজের জন্য রেখে দিন। এমন লোককেই তো আপনার কাজে নিযুক্ত করা উচিত যে কি-না শক্ত-সমর্থ আর বিশ্বস্ত।"[৩৯]

মূসা আলাইহিস সালামের সাথে নারীদ্বয়ের সাক্ষাৎ ছিলো একেবারে ক্ষণিকের। খানিক আগেই যার সাথে পরিচয়, যার সাথে তারা একটা কথা পর্যন্ত বলেনি, সেই লোক যে বিশ্বস্ত আর শক্ত-সামর্থ্য তা তারা বুঝলো কীভাবে?

তাফসীরে এটার সুন্দর একটা ব্যাখ্যা এসেছে। যে কূপ থেকে মূসা আলাইহিস সালাম মেয়ে দুটোর বকরিগুলোকে পানি খাইয়েছেন, সেই কূপের মুখে লোহার একটা ঢাকনা ছিলো। ঢাকনাটা এতো ভারী ছিলো যে, দশজন লোক মিলেও

---

৩৯. সূরা কাসাস, ২৮ : ২৬।

সেই ঢাকনা সরাতে বেগ পেতে হতো। মূসা আলাইহিস সালাম নারীদ্বয়ের বকরিগুলোকে নিয়ে কূপের পাড়ে গিয়ে দেখেন—কূপের কাছে এতোক্ষণ যারা ছিলো, তাদের প্রয়োজন ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে এবং তারা কূপের ঢাকনাটা লাগিয়ে দিয়েছে। নারীদ্বয় খেয়াল করলো—কূপের যে ঢাকনা দশজন[৪০] মিলেও সরানো দায়, সেই ঢাকনা মূসা আলাইহিস সালাম একাই সরিয়ে ফেলেছেন কারও সাহায্য ছাড়াই। এটা নারীদ্বয়কে বিস্মিত করেছে বটে, কিন্তু সেই বিস্ময় তারা মূসা আলাইহিস সালামের কাছে প্রকাশ করেনি। মূসা আলাইহিস সালামের এই কাজ দেখেই তারা বুঝতে পেরেছিলো যে—তিনি বেশ শক্ত-সমর্থ মানুষ।

তবে তিনি যে বিশ্বস্ত তা কীভাবে বুঝলো?

তাফসীরকারকগণ আরও বলেছেন—নারী দুজনের যে জন মূসা আলাইহিস সালামকে ডাকতে এসেছিলো, ফিরবার পথে সেই নারী আগে আগে হাঁটছিলো। চলার পথে বাতাসে বারবার তার গায়ের চাদর সরে যাচ্ছিলো বিধায় তাকে বেশ বিব্রত অবস্থায় পড়তে হচ্ছিলো। এটা দেখে মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, 'আমাকে আগে আগে হাঁটতে দিন। আমি যদি পথ ভুল করে অন্যদিকে পা বাড়াই, আপনি পেছন থেকে একটা পাথর ছুড়ে আমাকে সঠিক পথটা দেখিয়ে দিলেই হবে।'

মূসা আলাইহিস সালাম আগে আগে হাঁটতে চাইলেন এই জন্য যে—বাতাসে যদি মেয়েটার গায়ের চাদর সরেও যায়, তাঁর নজর যেন কোনোভাবেই সেদিকে নিবদ্ধ না হতে পারে। এতে নিজের দৃষ্টির হেফাযত যেমন হবে, তেমনি বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে বেঁচে যাবে মেয়েটা। আরও উল্লেখ্য যে—পথ হারালে মূসা আলাইহিস সালাম তাকে পাথর ছুড়ে সঠিক পথ নির্দেশ করতে বলেছেন, আওয়াজ করে পথ দেখিয়ে দিতে বলেননি। ওই অপরিচিতার কণ্ঠস্বর শোনাটাকেও নিজের জন্য উচিত মনে করেননি তিনি।

যে লোক নিজের চরিত্রকে, নিজের দৃষ্টিকে হেফাযতে এতোখানি তৎপর, যিনি একাকিনী রমণীদের কাছ থেকেও নিজের দৃষ্টিকে এভাবে আড়াল করেন, তাকে তো চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করে ফেলা যায়। সুতরাং তাঁর বিশ্বস্ততার ব্যাপারে

---

৪০. এখানে সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তাফসীরের বিভিন্ন বর্ণনায় ৭, ৩০, ৪০ এই সংখ্যাগুলোও এসেছে।

রমণীদের চিন্তা এখানে একটুও অমূলক ছিলো না।[৪১]

২

আমি ভাবি—বর্তমানের শো-অফের দুনিয়ায় মূসা আলাইহিস সালাম আমাদের জন্য কী চমৎকার দৃষ্টান্তই না রেখে গেলেন! আজকাল আমরা অন্যকে দেখানোর জন্য, অন্যের কাছে নিজের গুণ জাহির করার জন্য কতো চেষ্টাই না করি! আমি এমন অনেক ছেলেকে চিনি, যারা অন্যকে দেখানোর জন্য দামি মডেলের বাইক কেনে, দামি রেস্টুরেন্টে খেতে যায়। খুব পরিশ্রম করে সিক্স-প্যাক বডি তৈরি করে যাতে তাকে দেখে অন্যরা বাহবা দেয়। এমন অনেক মেয়েও আছে, যারা দামি কাপড়চোপড় পরে সাজগোজ করে বাইরে যায় অন্যকে আকৃষ্ট করতে। তাদের রূপ আর লাবণ্যে ডুবিয়ে রাখতে চায় অন্য সবাইকে।

অথচ—মূসা আলাইহিস সালাম মেয়ে দুটোকে মুগ্ধ করতে কিন্তু তাদের বকরিগুলোকে পানি খাওয়াতে ছুটে যাননি। তিনি মুগ্ধ করতে চেয়েছিলেন কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে। নিজের দৃষ্টি হেফাযতকে তিনি আল্লাহর বিধান হিশেবে মেনে চলেছেন। মেয়েটিকে সামনে চলতে দিলে তার দৃষ্টি হেফাযতে সমস্যা হতে পারে, শয়তানের ওয়াসওয়াসায় তিনি পরাস্ত হতে পারেন—এই ভয় থেকেই তিনি আগে আগে চলতে চেয়েছেন।

এই যে কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই কাজ করা, আল্লাহর বিধানকে ভালোবেসে আঁকড়ে ধরা, তা পালনে সর্বদা সচেষ্ট থাকা—এসবের বিনিময় হিশেবে মূসা আলাইহিস সালাম কী পেলেন?

মাদইয়ানে তিনি এসেছিলেন একেবারে অসহায় অবস্থায়। না ছিলো কোনো আশ্রয়, না ছিলো কোনো খাবার-দাবারের বন্দোবস্ত। অথচ এই একটা ঘটনার জের ধরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে আশ্রয় দিলেন একজন নেককার বান্দার গৃহে। কোনো কোনো তাফসীরকারকের মতে—ওই মেয়ে দুটোর বাবাও আল্লাহর একজন নবি ছিলেন। মূসা আলাইহিস সালাম শুধু যে আশ্রয় পেলেন

---

৪১. তাবারি, তাফসীর, ১৮/২২৫-২২৮; ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৬/২২৯; যুহাইলি, আত-তাফসীরুল মুনীর, ২০/৮৬; ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ৩১৮৪২।

তা কিন্তু নয়, ওই মেয়ে দুটোর একজনকে তিনি নিজের জীবনসঙ্গিনী হিশেবেও পেয়েছিলেন।

তাঁর শক্তিমত্তা তিনি কাজে লাগিয়েছেন মানুষের উপকারে। এই উপকার তিনি করেছেন শুধু আল্লাহকে খুশি করার জন্যই। নিজের অসহায়, ছন্নছাড়া অবস্থাতেও তিনি তার চরিত্র, তার দৃষ্টির হেফাযতের কথা ভুলে যাননি। এসবের পুরস্কার হিশেবে তিনি লাভ করেছেন একটা উত্তম আশ্রয়, একজন উত্তম জীবনসঙ্গিনী আর শ্বশুরকে পেয়েছেন একজন উত্তম অভিভাবক হিশেবে।

শো-অফের দুনিয়ায়, আমরা যারা অপরকে মুগ্ধ করার জন্য খেটেখুটে মরি, আমরা আসলে কী পাই দিনশেষে? আর মূসা আলাইহিস সালাম, যাঁর ব্রত-ই ছিলো কেবল আল্লাহকে মুগ্ধ করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, তিনি কী পাননি দুনিয়ার? এক মনীষী কতো সুন্দর বলেছেন—'সে কী পেলো, যে আল্লাহকে হারালো? আর সে কী হারালো, যে আল্লাহকে পেলো?'

প্রেমময় কথোপকথন

সূরা ত্ব-হার মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এবং মূসা আলাইহিস সালামের মধ্যকার একটা সুন্দর কথোপকথন আছে। মূসা আলাইহিস সালামের কাছে আল্লাহ জিগ্যেশ করছেন,

> وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يَا مُوْسٰى ۝
>
> "আর ওহে মূসা! আপনার ডান হাতে ওটা কী?"[৪২]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনেকগুলো গুণবাচক নাম রয়েছে, যেগুলোতে তাঁর সত্তা আর ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। আল্লাহর সেরকম একটা নাম হলো—'আল-বাসীর।' 'আল-বাসীর' শব্দের অর্থ হলো 'সর্বদ্রষ্টা', অর্থাৎ—যিনি সবকিছু দেখেন। 'সবকিছু দেখেন' শব্দদ্বয় যতো সহজে বলা যাচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নাম 'আল-বাসীর' শব্দের ভারত্ব কিন্তু ততো সহজ নয়। যা কিছু প্রকাশিত তা তিনি দেখেন, এবং যা কিছু অপ্রকাশিত, তা-ও তিনি দেখতে পান। গোটা সৃষ্টিজগতে এমন একটা বিন্দু, এমন একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকণা নেই, যা তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে। সাগরের বুকে তৈরি হওয়া একটা ছোট্ট ঢেউ, সেই ঢেউয়ের আরও ভেতরে তৈরি হওয়া কম্পন, সেই কম্পনে ছিটকে যাওয়া একবিন্দু জল—সেই ঘটনাচিত্রও আল্লাহর দৃষ্টির আড়াল হতে পারে না।

গভীর সাগরতলে যে ক্ষুদ্র নুড়িকণা, সেই নুড়িকণার নিচে তার চেয়েও ক্ষুদ্র যে প্রাণী, সেই প্রাণীর গায়ে থাকা তার চেয়েও ক্ষুদ্র বালিকণা—সেটাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেখেন।

ঘন গহীন অরণ্য, যেখানে আজতক কোনো মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি, গাছেদের ডালপালার ঘনত্বকে ফুঁড়ে যেখানে পৌঁছাতে পারে না সূর্যের প্রখর রশ্মি, প্রকাশ্য

---

৪২. সূরা ত্ব-হা, ২০ : ১৭।

দিবালোকেও অন্ধকারে ডুবে থাকা সেই জঙ্গলের একেবারে অবহেলিত কোণে বেড়ে ওঠা একটা ছোট্ট আগাছা, যার ডগায় আজ নতুন একটা কুঁড়ি বের হয়েছে, যে কুঁড়ির সন্ধান হয়তো কোনোদিন কোনো মৌমাছি পাবে না, যে কুঁড়ি থেকে প্রস্ফুটিত ফুলে কোনোদিন বসবে না কোনো প্রজাপতি—সেই অজানা, অবহেলিত ফুলও আল্লাহর দৃষ্টির অন্তরালে নেই।

এতো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, এতো সূক্ষ্ম বস্তুকণাও যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দৃষ্টি থেকে আড়াল না হয়, তাহলে মূসা আলাইহিস সালামের হাতে কী আছে, সেটাও কি তিনি দেখতে পাননি সেদিন? যদি দেখতেই পাবেন, তাহলে জিগ্যেশ করলেন কেন—'মূসা, আপনার হাতে ওটা কী?' মূসা আলাইহিস সালামের হাতে ওটা যে একটা লাঠি—সেটা আল্লাহর দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

কিন্তু তবুও—বাড়তি করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কেন মূসা আলাইহিস সালামের কাছে জানতে চেয়েছিলেন?

তাফসীরে এর একটা ব্যাখ্যা এসেছে। আয়াতের পরম্পরায় আমরা দেখতে পাই—খানিকটা পরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মূসা আলাইহিস সালামকে বলেন যে—তিনি যেন তাঁর হাতে থাকা লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করেন। মূসা আলাইহিস সালাম লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করার সাথে সাথে সেটা এক বিশালাকার সাপে পরিণত হয়, যা ফোঁসফোঁস করতে থাকে। এটা ছিলো মূসা আলাইহিস সালামকে দেওয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একটা মু'যিজা। তবে এই মু'যিজা প্রদানের আগে, কিংবা লাঠিটাকে সাপে পরিণত করে দেখানোর আগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মূসা আলাইহিস সালামের স্বীয় জবান থেকে সাক্ষ্য নিয়ে রাখলেন যে—ওটা আসলে লাঠিই ছিলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি মূসা আলাইহিস সালামের কাছ থেকে এই স্বীকারোক্তি নেওয়া ছাড়াই লাঠিটাকে সাপে পরিণত করে দেখাতেন, তাহলে মূসা আলাইহিস সালাম এরকম ভাবলেও ভাবতে পারতেন যে—আমি যেহেতু রাতের বেলা তূর পাহাড়ে এসেছি, অন্ধকারে ভুল করে লাঠির বদলে সম্ভবত এই সাপটাকে ধরে নিয়ে এসেছি না বুঝে। এটুকু সন্দেহও যাতে মূসা আলাইহিস সালামের মনে উদ্রেক না হয়, সেজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মু'যিজা প্রদানের আগে মূসা আলাইহিস সালামকে আরেকবার দেখিয়ে নিলেন হাতের

ওটা আসলে কী জিনিস। অর্থাৎ, 'হে মূসা, ভালো করে দেখে নিন আপনার হাতে থাকা বস্তুটা কী।' মূসা আলাইহিস সালাম যখন লাঠির দিকে আরেকবার তাকিয়ে সাক্ষ্য দিলেন যে এটা তাঁর লাঠি, তারপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেটাকে মাটিতে নিক্ষেপ করতে বললেন।[৪৩]

তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার 'ওহে মূসা, আপনার ডান হাতে ওটা কী'—প্রশ্নটা দ্বারা এটাও কি বোঝায় না যে—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আসলে বান্দার সাথে কথোপকথন পছন্দ করেন? তিনি চান তাঁর বান্দা তাঁর সাথে মন খুলে কথা বলুক। তিনি জানেন মূসা আলাইহিস সালামের হাতে কী আছে, তা সত্ত্বেও তিনি চাইলেন মূসা আলাইহিস সালামের সাথে আলাপ করতে। তাই তিনি জিগ্যেশ করলেন—'ওহে মূসা! আপনার ডান হাতে ওটা কী?'

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রশ্নের জবাবে মূসা আলাইহিস সালাম কী জবাব দিয়েছেন দেখুন। আল্লাহ যে 'আল-বাসীর' তথা 'সর্বদ্রষ্টা' তা তো মূসা আলাইহিস সালাম জানেন। তাঁর হাতের বস্তুটা যে কী, তা-ও তো আল্লাহ দেখছেন। তা সত্ত্বেও যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানতে চাইলেন 'ওটা কী', তা একটুও বিরক্তির উদ্রেক করেনি মূসা আলাইহিস সালামের মনে। তিনি বলে বসেননি, 'ইয়া আল্লাহ, আপনি তো সবকিছু দেখেন! আপনি দেখতে পাচ্ছেন না আমার হাতে এটা কী?'

বরং, মূসা আলাইহিস সালামের উত্তরের ধরন দেখে মনে হয়—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এমন প্রশ্নে তিনি অত্যন্ত খুশিই হয়েছিলেন। আল্লাহর প্রশ্নের জবাবে মূসা আলাইহিস সালাম বিনয় আর নম্রতার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটিয়ে বললেন,

> هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾
>
> "এটা আমার লাঠি। এতে আমি ভর দিই। এর সাহায্যে আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা পাড়ি এবং এতে করে আমার আরও অনেক কাজ হয়।"[৪৪]

---

৪৩. দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ১৬/৪২; ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৫/২৪৬; যুহাইলি, আত-তাফসীরুল মুনীর, ১৬/১৯৭; মাতুরীদি, তাফসীর, ৭/২৭৫।

৪৪. সূরা ত্ব-হা, ২০ : ১৮।

খেয়াল করুন—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রশ্ন করেছেন শুধু একটা। জানতে চেয়েছেন হাতে ওটা কী, কিন্তু মূসা আলাইহিস সালাম জবাব দিলেন তিন তিনটা!

'এটা আমার লাঠি'—মূসা আলাইহিস সালাম যদি আল্লাহকে শুধু এটুকু বলতেন তাহলেই হয়ে যেতো। কিন্তু তিনি সেখানে থামলেন না। একটা প্রশ্নের জবাবকে তিনি তিনটা উত্তরে সাজিয়ে বলেছেন—এতে আমি ভর দিই, এতে করে আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতাও পাড়া হয় এবং এতে করে আমার আরও কাজ হয়।'

ভর দেওয়া আর মেষপালের জন্য গাছের পাতা পাড়ার বাইরেও লাঠিটা দিয়ে নিজের আরও কিছু কাজ তিনি করেন। তবে সে কাজগুলো ভর দেওয়া আর গাছের পাতা পাড়ার মতো নিয়মিত কোনো কাজ নয়। সেগুলো খুবই অনুল্লেখযোগ্য। যেহেতু সেই কাজগুলো খুব কদাচিৎ করা হয়, সেগুলোর কথা আল্লাহকে না বললেও চলে। তিনি কথা বলছেন বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের সাথে—এমন সৌভাগ্য-লগ্নে জীবনের সকল খুঁটিনাটি মনে পড়বে তা তো নয়। কিন্তু মনে পড়ছে না বলে কি তিনি আল্লাহকে সেটা জানাবেন না? না, মূসা আলাইহিস সালাম সুযোগটা ছাড়তে রাজি নন। লাঠি দিয়ে আর কী কী কাজ তিনি করেন তা মনে না পড়ুক, তবু তিনি বললেন—'এটা দিয়ে আমার আরও অনেক কাজ হয়।'

আল্লাহর একটা প্রশ্নের জবাবে মূসা আলাইহিস সালাম তিন তিনটা জবাব কেন দিয়েছেন, জানেন? তিনি আসলে আল্লাহর সাথে কথা বলাটাকে দীর্ঘায়িত করতে চাইছিলেন। মহামহিম আল্লাহ, বিশ্বজাহানের অধিপতির সাথে কথা বলার সুযোগ—এ কী এতো সোজা কথা? তাই মূসা আলাইহিস সালাম কথা বাড়িয়েছেন যাতে আলাপটাকে দীর্ঘ করা যায়, প্রলম্বিত করা যায়।

আপনার প্রয়োজনের কথা, জীবনে যা কিছু আপনার খুব দরকার—তা ইতোমধ্যেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানেন। যা কিছু আপনাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, যে বাধা আপনাকে সামনে অগ্রসর হতে দিচ্ছে না, যে ভয় আপনার বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে—এসবের কোনোকিছুই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে অজানা নয়। কিন্তু তবুও—তিনি আপনার মুখ

থেকে সেগুলো শুনতে পছন্দ করেন, যেমনিভাবে মূসা আলাইহিস সালামের কাছ থেকে তিনি শুনতে পছন্দ করেছেন সেই লাঠির কথা।

আপনার প্রয়োজন আল্লাহকে জানান—ঠিক সেভাবে, যেভাবে মূসা আলাইহিস সালাম কথা বলেছেন আল্লাহর সাথে। বিনয় ধরে রেখে, আশার ফোয়ারা ছুটিয়ে, ভরসার পারদ উঁচু করে। মন-দিল খুলে আল্লাহর সাথে কথা বলুন। আপনার যা কিছু দরকার, যা কিছু আপনার পছন্দ। আল্লাহর সাথে কথা বলাটা হয়ে উঠুক আপনার দৈনিক রুটিনের অংশ। এই অভ্যেশটা ঠিক সেরকম নিয়মিত হয়ে যাক, যেরকম নিয়মিতভাবে বাতাস থেকে আপনি অক্সিজেন গ্রহণ করেন।

আপনি তাঁর সাথে কথা বলছেন—এই দৃশ্যটা আপনার রব খুব খুব পছন্দ করেন।

সোনার তোরণ পানে

কুরআনের সবচেয়ে ছোটো সূরাগুলোর একটি হলো সূরা আল-আসর। কলেবরে ছোটো; কিন্তু যে বার্তা এবং যে মর্মবাণী এই সূরা ধারণ করে, তা মোটেও ক্ষুদ্র নয়। বলা চলে—গোটা কুরআনের একটা সংক্ষিপ্ত সারমর্মই যেন আমাদের সামনে এই সূরা তুলে ধরে। কুরআনজুড়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে সমস্ত আদেশ-নিষেধ এবং আশার কথা আমাদের শুনিয়েছেন, তা যদি একটা নির্দিষ্ট সূরার মধ্যে নিয়ে আসতে বলা হয়, সূরা আল-আসর হবে সেই যথার্থ সূরাটাই। এজন্যই ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'মানুষ যদি কেবল সূরা আল-আসরের মর্ম অনুধাবন করতে পারতো, তাহলে তা-ই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো।'[৪৫] সাহাবাদের কাছে সূরাটির এতোখানিই গুরুত্ব ছিলো যে, তাঁরা যখন কোনো মজলিস সমাপ্ত করতেন, সমাপ্তি-পর্বে তাঁরা তিলাওয়াত করতেন সূরা আল-আসর।[৪৬]

সূরাটা শুরু হয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একটি শপথ দিয়ে। তিনি শপথ করেছেন সময়ের। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন কোনোকিছু নিয়ে শপথ করেন, তখন বুঝতে হবে বিষয়টার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য অনেক অনেক বেশি। সময় যে আমাদের জীবনের কতোটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা কেবল তারাই বুঝতে পারে, যারা সময়ের কাজ সময়ে না করে ভুক্তভোগী হয়েছে।

এই সূরায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সময়কে উল্লেখ করেছেন 'আসর' শব্দ দিয়ে। আরবিতে 'আসর' বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায়, যা ক্রমাগত নিঃশেষ হচ্ছে বা ফুরিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটাকে আমরা আরও সহজে বুঝতে

---

৪৫. ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৮/৪৭৯; যুহাইলি, আত-তাফসীরুল মুনীর, ৩০/৩৯১; ইবনু আশূর, আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর, ৩০/৫২৮; মুহাম্মাদ আবূ শাহবা, আল-মাদখাল লি-দিরাসাতিল কুরআন, ২৩৮।

৪৬. সুয়ূতি, আদ-দুররুল মানসূর, ৮/৬২১; যাহাবি, তারীখুল ইসলাম, ৩/৩৯২; তাবারানি, আল-মু'জামুল আওসাত, ৫১২৪।

পারি আসর সালাতের ওয়াক্তের দিকে তাকালেই। আসরের সালাত আমরা পড়ে থাকি দিনের একেবারে শেষলগ্নে। আসরের পরের ওয়াক্তই হচ্ছে মাগরিব। দিনের শেষ অংশটাই হচ্ছে আসর। এরপরেই সূর্যাস্ত। সূর্য ডুবে গেলেই মাগরিব নেমে আসে। আমাদের জীবনটাকে যদি একটা পূর্ণাঙ্গ 'দিন' হিশেবে ধরা হয়, তাহলে 'আসর' হচ্ছে আমাদের জীবনের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের মতোন। এমন মুহূর্ত যার ঠিক একটু পরেই আমাদের মৃত্যু হবে।

কেউ কেউ আবার 'আসর' শব্দটাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 'আসর' বলতে এমন এক অবস্থার কথা তারা বুঝিয়েছেন, যা ক্রমশ গলে যাচ্ছে। যেমন একখণ্ড বরফের টুকরো। বরফের টুকরোটা সময়ের ব্যবধানে গলতে গলতে একপর্যায়ে গিয়ে সম্পূর্ণটা গলে নিঃশেষ হয়ে যাবে। 'আসর' হচ্ছে সেরকম সময়, যা ক্রমশই গলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।[৪৭]

এই অর্থ ধরে যদি আমরা সূরা আসরের প্রথম দুই আয়াতকে বিশ্লেষণ করি, তাহলে খুব চমৎকার একটা ব্যাপার আমরা উপলব্ধি করতে পারবো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন,

> وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢
>
> "শপথ এমন সময়ের, যা ক্রমাগত ফুরিয়ে যাচ্ছে! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত।"[৪৮]

আচ্ছা, সময়ের সাথে মানুষের ক্ষতির কী সম্পর্ক? সময় বয়ে গেলে মানুষের ক্ষতি কীভাবে হয়? আদতে আমাদের জীবন সময়ের সমষ্টিমাত্র। সময় ফুরিয়ে যাওয়ার অর্থই হলো ক্রমাগত আমাদের ফুরিয়ে যাওয়া। সময় বয়ে যাচ্ছে; কিন্তু আমরা আমাদের চিরন্তন যে গন্তব্য, যেখানে আমাদের ঠাঁই হবে অনন্তকালের, আমাদের সেই অসীম যাত্রার ব্যাপারে আমরা চরম উদাসীন। আমরা জানি আমাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত। এটা এক মহা ধ্রুব সত্য। কিন্তু এই মহাসত্য জেনেও আমরা এমনভাবে জীবনযাপন করি, যেন আমরা কখনোই মৃত্যুবরণ করবো না। আমাদের জীবনের দিকে তাকালে মনে হবে—যেন আমরা মৃত্যুকে জয় করে বসে আছি। আখিরাতের সম্বল গোছানোর কথা উঠলে আমরা নিজেদের

---

৪৭. ইমাম রাযি, তাফসীর, ৩২/২৭৮।

৪৮. সূরা আসর, ১০৩ : ১-২।

মনগড়া যুক্তি দিই এবং প্রবোধ গুণে বলি—'জীবন তো কেবল শুরু। জীবন ও যৌবনের এই যৌথ আনন্দ থেকে এখনই যদি নিজেদের গুটিয়ে ফেলি—জীবনটাকে উপভোগ করবো কখন?'

একজন মনীষীর একটা সুন্দর কথা আছে। তিনি বলেছেন, 'সমস্যা হচ্ছে—আপনি মনে করছেন আপনার হাতে অনেক সময় আছে।'

খুবই নির্জলা সত্য কথা। আমাদের অধিকাংশের ভাবনাটাই আসলে এমন। আমরা মনে করি আমাদের হাতে পর্যাপ্ত সময় আছে আমল-ইবাদাত করার, নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার, কাজ করার। এই ভুল ভাবনার বাকশোতে বন্দী হয়ে আমরা পিছিয়ে দিই আমাদের চিন্তা, কাজ, আমল আর ইবাদাতকে। এই 'করবো আর কী'—ভাবনাটা আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোর একটা।

এই যে সময়ের সাথে আমাদের বিচ্ছিন্নতা, চরম উদাসীনতা—এ দুয়ের মাঝেই আমাদের অধিকাংশের মৃত্যু হয়। আমরা না দুনিয়া অর্জন করতে পারি, না আখিরাতের সম্বল কাঁধে করে পাড়ি জমাতে পারি অনন্তের স্রোতে। বিভ্রান্তির দোলাচলে, প্রবৃত্তির মায়াজালে আটকা পড়ে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস 'সময়'কে অবহেলা করেই কেটে যায় গোটা জীবন। কারও কারও নিভে যায় জীবন-প্রদীপ। সময়ের অসম ব্যবহারে, অগণন অপচয়ে আমরা যেভাবে বিভোর থাকি—এর চেয়ে বড় ক্ষতি একটা মানব-জনমের জন্য আর কী হতে পারে?

এজন্যই সময়ের শপথের ঠিক পরেই মানবজীবনের মহা-ভুলটাকে মোটাদাগে তুলে এনেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। তিনি বলেছেন—মানুষ এক নিরন্তর ক্ষতির মধ্যেই হাবুডুবু খাচ্ছে।

সূরাটির এতটুক অংশ পড়লে মনে হবে—হায়! তাহলে কি জীবনটা নিছক নিষ্ফল কেটে যাবে? অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যাওয়া ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো পথ খোলা নেই সম্মুখে? তবে কি এ-জীবন ব্যর্থ, যেভাবে ব্যর্থ হয় শিকারির বেখেয়াল তীর?

কিন্তু আমরা জানি—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কখনোই আমাদের হতাশ করেন না। তিনি অন্ধকারে আলোর রেখা তৈরি করে দেন। আলেয়াকে পরিণত

করেন আলোতে। তিনি পথহারাদের বাতলে দেন পথ। দিকভ্রান্ত নাবিককে দেখিয়ে দেন নিরাপদ কূল। সূরা আল-আসরে কঠিন একটা শপথ-বাক্যের পরে যে ভয়ংকর বার্তা তিনি আমাদের শুনিয়েছেন, তার ঠিক পর পর তিনি সঞ্চার করেছেন আশার বিন্দু। সেই বিন্দুগুলোকে যদি ধারণ করা যায় জীবনে—আশা করা যায় আমাদের কারও জীবন ব্যর্থ হবে না কখনোই।

'মানুষ নিরন্তর ক্ষতির মাঝে হাবুডুবু খায়'—মর্মে একটা কঠিন হুঁশিয়ার-বার্তা স্পষ্ট জানিয়ে পরের বাক্যটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুরু করেছেন 'তবে' দিয়ে।

মানুষ ক্ষতির মধ্যে আগাগোড়া নিমজ্জিত, তবে...

তবে কী? ঠিক এই জায়গা থেকেই আমাদের জন্য আশার বিন্দুদের উদ্বোধন। ভরসার নিশান যেন এখান থেকেই উড়াল দিয়েছে অসীমপানে।

'তবে' দিয়ে যে বাক্য-বন্ধনীটাকে তিনি জোড়া লাগিয়েছেন সেটা বেশ মজার! যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের শাসন করার পরে সাহস জোগাচ্ছেন!

'তবে' বলার পরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সামনে হাজির করেছেন এমন কয়েকটা বৈশিষ্ট্য, যা নিরন্তর ক্ষতির সমুদ্র থেকে আমাদের টেনে তুলে আনবে। তিনি আমাদের কাছে স্পষ্ট করেছেন এমন কিছু কাজ, যা আমাদের এনে দেবে আখিরাতের অনাবিল আনন্দ। সবাই যেখানে ব্যর্থ, হতাশ ও দিশেহারা, সেখানে এই বৈশিষ্ট্য-কতিপয় আমাদের পৌঁছে দেবে কাঙ্ক্ষিত সোনার তোরণের কাছে, যা অর্জনের স্বপ্ন আমরা পুষে রেখেছি বুকে।

মানুষ নিরন্তর ক্ষতির সমুদ্রে নিমজ্জিত, তবে তারা ব্যতীত। কারা সেই সকল মানুষ? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন :

> إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣
>
> "যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, সত্যের দাওয়াত দেয় এবং ধৈর্যের দাওয়াত দেয়।"[৪৯]

৪৯. সূরা আসর, ১০৩ : ৩।

ভয়ংকর একটা শপথ বাক্য দিয়ে বক্তব্য শুরু করে অধিকাংশ মানুষের ক্ষতির ইশতেহার ঘোষণার পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের চিনিয়ে দিচ্ছেন সফলতার সিঁড়ি। এই সিঁড়ি বেয়ে অসীমপানে যারা উঠতে পারে, যারা ছুঁতে পারে অনন্তের পথ, তাদের মানবজনম-ই কেবল সফল।

যারা ঈমান আনবে।

এরপর যারা আমলে সালিহ তথা নেক আমল করবে।

যারা সত্যের দাওয়াত দেবে এবং

যারা ধৈর্যের উপদেশ দেবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কর্তৃক প্রণীত সফল মানবজীবন গঠনের চারটে সূত্র এগুলোই। দুনিয়ার জীবনে চারপাশের অসংখ্য মোটিভেশনাল স্পিকারের কাছে আপনি শুনেছেন সফল হওয়ার নানান তরিকা। 'তুমিও পারবে'—বলে তারা আপনাকে নামিয়ে দিয়েছে একটা অসম যুদ্ধে, অন্যায্য প্রতিযোগিতায়; কিন্তু যে সফলতার কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সূরা আল-আসরে শোনাচ্ছেন, তা জাগতিক কোনো ক্ষণস্থায়ী সফলতা নয়। আমাদের চিরস্থায়ী নিবাস, যেখানে আমাদের অনন্তকালের যাত্রা সেই জগতের সফলতার তরিকাই তিনি বর্ণনা করেছেন এখানে। যদি আমরা আল্লাহর বলে দেওয়া এই তরিকা অনুসরণ করি, যদি নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করি এর মর্মবাণী; আশা করা যায় মৃত্যুর পরে যে অনন্ত জীবনের হাতছানির প্রতিশ্রুতি আমাদের রব প্রদান করেছেন কুরআনে, সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে অনাবিল সুখ আর আনন্দ। সেখানে আমরা হবো আগাগোড়া সফল মানুষ। কোনো ক্ষতি, কোনো দুঃখ, কোনো ক্লেশ সেখানে আমাদের স্পর্শ করবে না। কোনো মন খারাপের গল্প, কোনো অপূর্ণতা আর শূন্যতা সেখানে নাগাল পাবে না আমাদের।

আমরা বিশ্বাস করি—আমাদের এই জীবন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দান। তিনিই যেহেতু এই জীবনের মালিক, তাঁর বলে দেওয়া উপায় আর বাতলে দেওয়া পদ্ধতি নিয়ে তখন বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করবার কোনো অবকাশ নেই। তিনি জানাচ্ছেন—সফল হতে হলে আমাকে সবার আগে ঈমান আনয়ন করতে হবে। সফল জীবনের জন্য এটা একেবারে মৌলিক একটা দাবি। ঈমান ব্যতীত কোনো অবস্থাতেই আমরা সফল হওয়ার আশা করতে পারি না। ঈমান

মানে হলো আল্লাহকে বিশ্বাস করা, নবি-রাসূল, তাঁদের প্রতি নাযিলকৃত আসমানি গ্রন্থ, ফেরেশতা, তাকদীর এবং আখিরাতের ব্যাপারে অন্তর থেকে বিশ্বাস স্থাপনের নামই হলো ঈমান। ঈমান আনয়নের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যতগুলো শর্ত বেঁধে দিয়েছেন তার সবটাতেই বিনা প্রশ্নে, বিনা বাক্যে এবং বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করতে হবে। এর কোনো একটাতে অবিশ্বাস করা কোনোভাবেই চলবে না।

সফল হওয়ার প্রথম ধাপ অতিক্রমের পর আমাদের দ্বিতীয় কাজ হলো আমলে সালিহ তথা নেক আমল করা। শুধু ঈমান আনলেই কাজ ফুরিয়ে যায় না। ঈমান আনার পর তার পরিপূর্ণতা দিতে আমল শুরু করতে হয়। কেউ ঈমান আনলো কিন্তু আমল করতে চাইলো না—এর অর্থ হলো তার ঈমান আনয়ন আদতে পরিপূর্ণ হয়নি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য যেসব ইবাদাত ফরয করেছেন, তা অবশ্যই অবশ্যই পালন করা, আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় হারাম থেকে বেঁচে থাকা, সুন্নাহর রঙে নিজের জীবনকে রাঙিয়ে নেওয়া, জীবনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম বিষয়েও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটা প্রয়াস নিজের ভেতর জিইয়ে রাখতে পারলেই নেক আমলের তাড়না আমাদের মাঝে বলবৎ থাকবে।

সফল হওয়ার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জুড়ে দেওয়া প্রথম শর্ত দুটো সম্পূর্ণটাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তিক জায়গা থেকে নিজেকে উন্নত করা, আখিরাতের জীবনের জন্য নিজের রসদ গোছানো, নিজের আমল আর ইবাদাতের জায়গাকে পাকাপোক্ত করার আহ্বান এই দুটো শর্তে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু ইসলাম কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাসের নাম নয়। 'একলা চলো রে' নীতিতে বিশ্বাস করে না ইসলাম। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র নিয়ে ইসলামের আছে সুন্দর এবং পরিশীলিত ভাবনা। তাই 'সফলতার চাবিকাঠি' হিশেবে যে চারটে শর্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জুড়ে দিয়েছেন, সেই চারটে শর্তের পরের দুটোকে তিনি ব্যক্তিক পর্যায় নয়; বরং পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থের সাথেই একাত্ম করেছেন।

ঈমান আনা এবং নেক আমল করার মাধ্যমে নিজের জীবনে আমরা ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করি, কিন্তু এখানেই আমাদের দায়-দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। যে দ্বীনের

সন্ধান আমি পেয়েছি, যে মহান জীবনের মাঝে আমি সঁপে দিয়েছি নিজেকে— আমার অধস্তন, আমার প্রতিবেশী, বন্ধু, আত্মীয়, পরিবার-পরিজনের কাছেও সেই দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার একটা তাগাদা ইসলাম আমাকে দেয়। এই তাগাদা নিছক কোনো বাগাড়ম্বর নয়। এটাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সফল হওয়ার একটা শর্ত হিশেবে উল্লেখ করেছেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"প্রচার করো; যদি একটি আয়াতও হয়।"[৫০]

আমরা যা শিখেছি এবং যা জেনেছি, তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটা গুরুদায়িত্ব সর্বদা আমাদের কাঁধে এসে বর্তায়। এই দায়িত্বকে আমরা অবহেলা করতে পারি না কোনোভাবেই। প্রচারের যেকোন মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে আমরা সেই কাজটা করতে পারি। আমাদের নিজেদের পরিবর্তনও হতে পারে অন্যের জন্য দাওয়াতের একটা মাধ্যম। আমাকে দাড়ি রাখতে দেখে আমার ছোটোভাই কিংবা কোনো বন্ধু অথবা আমার অফিসে আমার কোনো অধস্তন কর্মচারীও যদি দাড়ি রাখতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং আমার দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহলে আমার পরিবর্তন একপ্রকার সত্যের দাওয়াত। আমার পরিবর্তন যদি আমার পরিবারকে শির্ক, কুফর, বিদআত থেকে, সুদ এবং ঘুষ থেকে নিবৃত্ত করতে পারে, তাহলে আমার পরিবর্তন নিঃসন্দেহে এক উত্তম দাওয়াত। কোনো বোনকে হিজাব পরতে দেখে যদি তার মা, বোন এবং তার পরিবারের অন্য নারীরাও হিজাব পরতে আগ্রহী হয়ে ওঠে, তাহলে বোনটার পরিবর্তন এখানে সত্য প্রচারের কাজ করে। আমাদের উত্তম আচরণ, উত্তম ব্যবহার যদি কারও মনে দাগ কাটে, কোনো পাথরসম হৃদয়ে ফোটায় কোমল কুঁড়ি, তাহলে আমার আচরণ এখানে সত্য প্রচারে ভূমিকা রাখে।

আমরা পরিবারে দাওয়াতের কাজ করবো। আমাদের পরিবারের যে সকল সদস্যরা টিভি-সিরিয়ালে বুঁদ হয়ে থাকে, আমাদের যে ভাইটা মুভি, মিউজিক আর ভিডিও গেইমসে পার করে দেয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা, শুক্রবারের জুমুআ ব্যতীত পরিবারের যে লোকটা কোনোদিন মসজিদ-মুখী হয় না, পরিবারের যে নারী পর্দা-হিজাব করে না, পর-পুরুষের সামনে অবাধ যাতায়াত করে, ঘরের যে

---

৫০. বুখারি, ৩৪৬১; তিরমিযি, ২৬৬৯; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ, ৬২৫৬; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৬৪৮৬; দারিমি, আল-মুসনাদ, ৫৫৯।

লোক তার আয়-উপার্জনে হালাল-হারামের বাছবিচার করতে চায় না—তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা পৌঁছানোর চেষ্টা করবো সত্যের বাণী। ফরয বিধানের কথা, হালাল-হারামের কথা তাদের কাছে তুলে ধরা আমাদের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। যদি তাদের কপালে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হিদায়াত রাখেন, তাহলে তারা আল্লাহর বিধানকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেবে। যদি হিদায়াত না থাকে তাহলে তাদের ফেরাবার সাধ্য দুনিয়ার আর কার আছে? আমাদের কাজ শুধু সঠিক রাস্তাটা দেখিয়ে দেওয়া। দুনিয়াতে এমন অনেক নবি-রাসূলগণ এসেছেন যাঁদের একজন অনুসারীও জোটেনি; অর্থাৎ যাঁদের দাওয়াতে একজন মানুষেরও হিদায়াত হয়নি। এটা সেসকল নবি-রাসূলগণের ব্যর্থতা নয়; এটা বরং সেই মানুষগুলোর দুর্ভাগ্য যে তারা সরাসরি নবি-রাসূলগণের সাক্ষাৎ পেয়েও হিদায়াতের রাস্তা চিনতে পারেনি।

সফলতা লাভের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাতলে দেওয়া শেষ শর্তটা হলো—ধৈর্যের দাওয়াত। এই গুণ সবার আগে নিজের মাঝে ধারণ করতে হবে, এরপর এই গুণ লাভের জন্য অন্যকেও উৎসাহিত করতে হবে ব্যাপক-আকারে।

আমরা জানি দুনিয়ার কোনো বিপ্লব, কোনো পরিবর্তন কখনোই ফুল বিছানো পথে অর্জিত হয়নি। বিপ্লবের জন্য ত্যাগ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। আমরা যখন বদলে যাবো, যখন সমাজের প্রবহমান স্রোতের বিপরীতে গিয়ে চলে আসা অন্যায় আর অনিয়মের বিরুদ্ধে আমরা ঘোষণা করবো চূড়ান্ত বিরোধিতা, সমাজ তখন আমাদের ভালো চোখে দেখবে না। আমাদের থামিয়ে দিতে, আমাদের ভেতর সঞ্চারিত সত্যের সু-বাতাস নিঃশেষ করে দিতে কলুষিত সমাজ তার সমস্ত শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। জীবনের এহেন মুহূর্তে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ও অধিষ্ঠিত থাকতে সকলের দরকার হয় ধৈর্য-ধারণের। অনেক প্রিয়জন, প্রিয়মুখ, অনেক বন্ধু-সুহৃদ, অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী-শুভাকাঙ্ক্ষী তখন আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। জীবনের পরমপ্রিয় মুখগুলোকে বিরোধী শিবিরে দেখে ক্ষত-বিক্ষত হতে পারে আমাদের অন্তর। ভেঙে পড়তে পারে আমাদের মনোবল। কিন্তু হতাশ হলে চলবে না। এ যে সফলতার-ই সিঁড়ি। একে অতিক্রম করা না গেলে, একে টপকানো না গেলে আমরা পৌঁছুতে পারবো না আমাদের কাঙ্ক্ষিত মঞ্জিলে। তাই সফলতা অর্জনের এই সর্বশেষ সমীকরণে দাঁড়িয়ে ধৈর্য-ধারণ

এবং ধৈর্য-ধারণের দাওয়াত বিলানোকেই বানাতে হবে আমাদের জীবনের ব্রত। সফল মানবজনম গঠনের জন্য আল্লাহর বলে দেওয়া এটাই সর্বশেষ তরিকা।

আমরা যদি সূরা আল-আসরকে একনজরে বুঝতে চাই, তাহলে নবি-রাসূলদের জীবন-কাহিনী হতে পারে আমাদের জন্য উৎকৃষ্ট উদাহরণ। নিঃসন্দেহে—পৃথিবীতে পদচিহ্ন রাখা সকল মানুষের মধ্যে তাঁরাই সবচাইতে সফল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আসরে 'সফল' হওয়ার জন্য আমাদের যে চারটি মূলনীতির কথা শোনাচ্ছেন, তার সবকয়টাই তাঁদের জীবনে নানানভাবে পরীক্ষিত। দুনিয়ার সমস্ত অসত্য ইলাহকে অস্বীকার করে তাঁরা কেবল আল্লাহর ওপরই দৃঢ়চিত্তে ঈমান এনেছিলেন। তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সালিহ তথা নেক বান্দার জ্বলজ্বলে উদাহরণ। তাঁরা যেরকম আর যে পরিমাণ আমল করতেন, তা দুনিয়ায় আর কারও পক্ষেই করা সম্ভব নয়। তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিলো সত্যের দাওয়াত সর্বত্র বিলিয়ে দেওয়া এবং এই কাজ করতে গিয়ে তাঁরা পদে পদে সম্মুখীন হয়েছেন পাহাড়-সম বাধার। তখন ধৈর্য ধরে এবং ধৈর্য-ধারণের দাওয়াত দিয়ে তাঁরা আমাদের জন্য হয়ে আছেন অনুসরণের মূর্ত প্রতীক। আদতে নবি-রাসূলগণের পুরো জীবনটাই যেন সূরা আল-আসরের বাস্তবায়ন।

এই তো সূরা আল-আসরের নির্যাস; সফলতার চারটে সোপান। এই সোপানগুলোতে ভর করে আমরা পৌঁছুবো আমাদের কাঙ্ক্ষিত মঞ্জিলে। আমাদের সোনালি কাবিনের কবি আল মাহমুদের ভাষায়—'আমাদের গন্তব্য তো এক সোনার তোরণের দিকে যা এই ভূপৃষ্ঠে নেই।'

অনন্ত যাত্রায় অবগাহন করে সেই সোনার তোরণ পানে ছুটতে হলে সফলতার এই চারটে সূত্রকে জীবনে আমাদের ধারণ করতে হবে।

প্রবল প্রতাপশালী তবু মহীয়ান

১

মেয়ের জন্ম সনদ করতে গিয়ে আমার একেবারে জনমের তরে শিক্ষা হয়েছে!

মেয়ের বয়স দুই বছরে পা দিলে ভাবলাম ওর জন্ম সনদটা করে রাখা যাক। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে অবশ্য এসব জন্মসনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র কিংবা পাসপোর্টের এতো ঝক্কি-ঝামেলা নেই। এগুলো যেহেতু নাগরিক অধিকারের আওতাভুক্ত, রাষ্ট্র নিজে দায়িত্ব নিয়ে নাগরিকের এসব ব্যাপার-স্যাপার দেখভাল করে। হয় রাষ্ট্র নিজে দায়িত্ব নিয়ে এসব করে দেয়, নতুবা নাগরিকেরা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে কোনো ধরনের ঝামেলা ছাড়াই এসব কাগজপত্র তৈরি করে নিতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর যা অবস্থা, এখানে একটা দরকারি কাগজ রাষ্ট্র নিজে করে দেওয়া তো দূর, নাগরিক নিজে করতে গেলে তাকে তার সময়, শ্রম আর পকেট—এই তিনটার দিকে বারংবার তাকাতে হয়। তার ওপর উপরি-পাওনা হিশেবে সেসকল প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মচারীদের মধু-মাখা আচার-আচরণ তো থাকেই।

জন্ম সনদটার জন্য আমি ঢাকা থেকে গ্রামে এসে ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে উপস্থিত হলাম। দুটো মানুষ বড় বড় দুটো কম্পিউটার সামনে নিয়ে সেই অফিসে বসে আছে। তাদের চোখেমুখে রাজ্যের ব্যস্ততা!

জন্মসনদ করতে হলে কী করতে হবে জিগ্যেশ করতেই তাদের একজন আমাকে একটা ফরম দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'এইটা পূরণ করে, সাথে বাচ্চার এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি অ্যাটাচ করে এনে জমা দিয়ে যাবেন।'

ফরমখানা হাতে তুলে নিয়ে আমি প্রস্থান করলাম সেদিন। দরকারি তথ্যাদি দিয়ে

সেটা পূরণ করে পরেরদিন যথারীতি জমাও দিয়ে গেলাম।

যেহেতু আমাকে কাজের জন্য পুনরায় ঢাকা চলে আসতে হবে এবং মেয়ের জন্মসনদ করে যাওয়াও সমান প্রয়োজন, তাই জমা দেওয়ার দুদিন পর আমি পুনরায় ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে উপস্থিত হয়ে তাদের জিগ্যেশ করলাম, 'ভাই, একটা ফরম জমা দিয়েছি গত পরশু। কী অবস্থায় আছে একটু জানানো যাবে? আমার ঢাকা যাওয়ার তাড়া আছে। সম্ভব হলে কাগজটা সাথে করে নিয়ে যেতে চাই।'

আমার সম্মুখে কম্পিউটারে যে চোখ ডুবিয়ে রেখেছে তার বয়স আনুমানিক পনেরো কী ষোলো হবে। আমার আবদার শুনে এই আপাত কিশোর ছেলেটা মনে হলো যথেষ্টই ক্ষেপে গেলো। রাগ এবং বিরক্তি-মাখা গলায় সে আমাকে হাত উচিয়ে বললো, 'জিনিস রেডি হয়ে গেলে ম্যাসেজ যাবে। এখন বাড়ি চলে যান।'

ধমক শোনা, এ-টেবিল থেকে ও-টেবিল দৌড়াতে দৌড়াতে সময় অপচয় করা এবং তাদের হাতের মধ্যে পাঁচশো বা একহাজার টাকার নোট গুঁজে দেওয়াই যেহেতু এখানকার চিরাচরিত নিয়ম—তাই একরাশ হতাশা নিয়ে ফিরে আসা ছাড়া আমার আর উপায় কী!

এলাকায় আমার এক পাড়াতো চাচাতো ভাই রাজনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমার সাথে হৃদ্যতারও কমতি নেই কোনো। দেখা হওয়ার পর এ-কথা সে-কথা বলার পরে জানতে চাইলো কবে এসেছি ঢাকা থেকে। তাকে বললাম, 'এসেছি তো দিনকয়েক হলো। মেয়েটার জন্মসনদ করাতেই আসা। কিন্তু এসে তো পড়েছি বিপাকে। ইউনিয়ন পরিষদের সেবার এতো বাজে অবস্থা! আবেদন করেছি তিন-চারদিন হয়ে গেলো, খোঁজ নিতে গেলে তারা তো মনে হলো ক্ষেপেই গেলো আমার ওপরে। আরে বাবা! আমার কাগজ দিতে সময় লাগবে সেটা আমাকে বুঝিয়ে সুন্দরভাবে বললেই তো হয়।'

তার মনে হয়তো দয়ার উদ্রেক হলো। আমাকে বললো, 'চিন্তা করো না। দেখি আমি কিছু করতে পারি কি না।'

সেই বিকেলেই তার নাম্বার থেকে ফোন এলো আমার কাছে। কয়েকটা দরকারি

তথ্য জানতে চাইলো। মেয়ের নামের বানান, জন্মতারিখ ইত্যাদি মিলিয়ে দেখতে বললো ঠিক আছে কি না। সব ঠিক আছে বলার পরে সে জানালো আগামীকাল বা পরশু কাগজটা হাতে পেয়ে যাবো।

২

সরকারি অফিসে গিয়ে আমি সুবিধে পাইনি, কিংবা রাজনৈতিক 'মাধ্যম' ধরে সুবিধে আদায় করেছি—এমন গল্প শোনাবার জন্য এই ঘটনার অবতারণা করিনি। ঘটনাটা থেকে আমি একটা জিনিস উপলব্ধি করলাম। আমাদের চারপাশের মানুষেরা, যারা ক্ষমতা-বলয়ের মাঝে বসবাস করে, তারা কেন যেন ক্ষমতা-বলয়ের বাইরের মানুষদের পাত্তাই দিতে চায় না। পারলে সামনে থেকে ধুর ধুর করে তাড়িয়ে দেয়। সরকারি অফিসে কাজকর্ম যারা করে, তাদের অধিকাংশই নিজ নিজ টেবিলে একেকজন 'প্রাইম মিনিস্টার' বনে যান। তাদেরকে 'স্যার' সম্বোধন করে কথা বলতে হয়। নতজানু হয়ে দাঁড়াতে হয় তাদের সামনে। তাদের প্রতিটা কথা খুবই মনোযোগের সাথে শুনতে হয় এবং সাথে সাথে 'জি স্যার' বলতে হয়। তবে—কেউ যদি সেই প্রাইম মিনিস্টারের চেয়ে বড় কোনো প্রাইম মিনিস্টারের রেফারেন্স সাথে করে আনতে পারেন, দৃশ্যপট তখন একেবারে ভোজবাজির মতো পাল্টে যায়। তাকে আদর-আপ্যায়ন করা হবে, ভালো চেয়ারে বসতে দেওয়া হবে এবং রীতিমতো খোশালাপও জমে উঠবে। এখানে—সমাজের মাঝেরজন তার ওপরেরজনকে সমীহ করে এবং তার নিচেরজনকে সজোরে লাথি দেয়।

ক্ষমতার সামান্য স্পর্শ পেলেই এখানে একজন মানুষ অন্য আরেকজন মানুষের কোনো কথাই শুনতে চায় না। কিন্তু কী সৌভাগ্য আমার—আমি এমন একজন রবের ইবাদাত করি, এমন একজন রবের আমি বান্দা যিনি মহাবিশ্বের সবকিছুর ওপর একচ্ছত্র ক্ষমতাবান হওয়ার পরেও অধীর অপেক্ষায় থাকেন, কখন আমি তাঁকে ডাকবো! কখন তাঁর কাছে আমি জিজ্ঞাসা আর আবদারের থালা নিয়ে দাঁড়াবো তার দিকে তিনি চেয়ে থাকেন। আমি স্যুটেট-বুটেড বাবু কি না, আমার কতোখানা গাড়ি-বাড়ি আছে, ক্ষমতা-কেন্দ্রে আমার প্রতাপ কতোখানি, ইউরোপ-আমেরিকায় আমার ধন-সম্পদের পাহাড় কী রূপ—এসবের

কোনোকিছুই তাঁকে ডাকার জন্য শর্ত নয়। দুনিয়ার বাদশাহ তাঁকে স্মরণ করলে তিনি যতোখানি গুরুত্ব দেন, পথের ভিখারির বেলাতেও ঠিক তা-ই। গুরুত্ব অবশ্যই বাড়ে-কমে, তবে তা ধন-সম্পদ, ক্ষমতা আর চেহারার চাকচিক্যে নয়, অন্তরের অবস্থাভেদে। যার অন্তর তাঁর প্রতি যতো বেশি অনুরক্ত, তার প্রতি তিনি ততো বেশিই সদয়।

তাঁকে ডাকার জন্য আমার কোনো সিরিয়ালের দরকার হয় না। তাঁর সুনজরে আসার জন্য দরকার পড়ে না কোনো ক্ষমতাবানের রেফারেন্স। আমার জন্য তার দরোজা কখনো বন্ধ হয় না। দুনিয়ার ক্ষমতাবানদের ডাকলে তারা কপাল কুঁচকায়, কিছু চাইলে তারা বিরক্ত হয়। কিন্তু আমার মহামহিম রব সেরকম নন। তাঁর ক্ষমতা মহাবিশ্ব-ব্যাপী পরিব্যাপ্ত! সৃষ্টিজগতের তিনিই ইলাহ, একাধিপতি। তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন হাজার আলোকবর্ষ মাইল দূরের নীহারিকা আর গ্রহপুঞ্জ। মহাশূন্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য অগণিত কৃষ্ণগহ্বর, যার হদিস মানুষের দ্বারা কোনোদিন পাওয়া সম্ভব নয়, সেই কৃষ্ণগহ্বরগুলোতে একটা অনুচ্চ আওয়াজও হয় না যার ব্যাপারে তিনি ওয়াকিবহাল নন। সাগরতলের অতিশয় ক্ষুদ্র পাথরের নিচে থাকা একটা পিঁপড়ে, সেই পিঁপড়ের খাবারের বন্দোবস্ত করতেও তিনি কখনো ভোলেন না। গাছ থেকে যখন একটা শুকনো পাতা ঝরে পড়ে, সেই ঘটনাটাও বাদ যায় না তাঁর তদারকি থেকে। গোটা মহাবিশ্বকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন অত্যন্ত সুচারুরূপে, সেই তিনি কিনা আমার মতো এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সৃষ্টিজীবকে উদ্দেশ্য করে বলছেন—

> ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ
>
> "আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।"[৫১]

দুনিয়ার মানুষেরা সামান্য ক্ষমতা পেলেই যেখানে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, মানুষকে অবজ্ঞা-অবহেলা করার সামান্যতম সুযোগও ছাড়ে না, সেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী এক সত্তা আমাকে বলছেন যেন আমি তাঁকে ডাকি, এবং তিনি এ-ও জানাচ্ছেন—আমি ডাকলে তিনি অবশ্যই আমার ডাকে সাড়া দেবেন।

---

৫১. সূরা গাফির, ৪০ : ৬০।

এমন নয় যে তিনি আমার কোনো কথা শোনেন আর কোনো কথা শোনেন না। এমনও নয়—আমার গুনাহের পরিমাণ অধিক বলে আমাকে তিনি কম গুরুত্ব দেবেন। সূরা হূদের মধ্যে কতো স্পষ্টভাবেই না তিনি ঘোষণা করলেন—

إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

"নিশ্চয় আমার রব (সকলের) খুবই সন্নিকটে, তিনি প্রার্থনায় সাড়াদানকারী।"(৫২)

আমার সামাজিক মর্যাদা, আমার প্রভাব-প্রতিপত্তি, আমার সম্পদের পরিমাণ—এসবের ওপর নির্ভর করে তিনি আমার প্রার্থনা শোনেন না। যে-ই তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, যে-ই তাঁকে ডাকে, তার প্রার্থনা, তার ডাক তিনি শোনেন।

সূরা বাকারার মধ্যেও কতো সুন্দরভাবেই না আমাদের রব বলেছেন—

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ

"যখন আমার বান্দারা আপনাকে জিগ্যেশ করে আমার সম্পর্কে, আমি তো (তাদের) নিকটেই আছি। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে, আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই।"(৫৩)

আল্লাহর কাছে দুআ করার সময় আমি তন্ময় হয়ে ভাবি—দুনিয়ার কতো প্রান্ত থেকে কতো মানুষ তাঁকে ডাকছে। কতো হাত তাঁর দরবারে উত্তোলিত হয়ে আছে। কতো হৃদয় তাঁর কাছে তুলে ধরছে তাদের প্রয়োজন। প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত-প্রতিটা মুহূর্ত কতো মানুষ ভাঙা হৃদয় নিয়ে দাঁড়াচ্ছে তাঁর দুয়ারে। তিনি সবার সাথে সাথে আমার প্রার্থনাও শুনছেন। আসমানের কোনো একটা জায়গায় আমার প্রার্থনাগুলোও পৌঁছাচ্ছে—এই অনুভূতি আমার মাঝে কী যে এক ভালো লাগা তৈরি করে, তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়।

আমি এমন রবের ইবাদাত করি, যাঁর কাছে আমার আকুতি পৌঁছাতে দরকার পড়ে না অন্য কারও তদবির। উপরি-পাওনা না হলে কেউ আমার আকুতি তাঁর কাছে যাওয়া থেকে আটকে দেবে, তাঁর আরশ পর্যন্ত পৌঁছাতে দেবে না—এমন

---

৫২. সূরা হূদ, ১১ : ৬১।

৫৩. সূরা বাকারা, ২ : ১৮৬।

কোনো ভয় নেই। আমি এমন রবের ইবাদাত করি যিনি উন্মুখ হয়ে থাকেন বান্দা কখন তাঁকে ডাকবে আর তিনি সাড়া দেবেন। আমি এমন রবের ইবাদাত করি যিনি আমার প্রতিটা মুহূর্তকে মূল্যায়ন করেন। একটা মুহূর্তের জন্যও আমাকে আড়াল হতে দেন না।

ক্ষমতার সামান্য ছোঁয়া পেলে যেখানে মানুষের পা আর মাটিতে পড়তে চায় না, সেখানে আসমান-জমিনের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী যিনি, তিনি আমার সকল প্রার্থনাকেই গুরুত্ব দিয়ে শোনেন, আমাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন 'আমায় ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।'

এক জীবনে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কিছু হয়?

অন্তরে অন্তরে

কখনো কি এমন হয়—কারও উন্নতি দেখে রাগে ক্ষোভে জ্বলে ওঠে আপনার গা? কেউ ভালো চাকরি পেয়েছে শুনে আপনার মন কি বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে যায়? কারও পদোন্নতি দেখে খুশি হওয়ার পরিবর্তে আপনি কি বেজার হয়ে ওঠেন? কারও সংসারের সুখ-শান্তি দেখে আপনার কি ভীষণ অস্বস্তি হয়? কেউ বাড়ি করছে, গাড়ি করছে, আপনাকে ডিঙিয়ে কেউ এগিয়ে যাচ্ছে—এসব দেখে কি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন আপনি? কারও ব্যবসা দুই টাকা বেশি লাভ করছে, কারও কথা দুটো মানুষ বেশি শুনছে—এসব দেখে আপনার মেজাজ কি তিরিক্ষি হয়ে ওঠে?

এসবের কোনো লক্ষণ যদি আপনার মাঝে বিদ্যমান থাকে, তাহলে বুঝে নিন—এক কঠিন অন্তর-ব্যধিতে আপনি আক্রান্ত এবং সেটার নাম—হাসাদ।

'হাসাদ' শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো হিংসা। কোন ধরনের হিংসাকে হাসাদ বলা হয়, জানেন? ধরুন কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোনো নিয়ামত দান করেছেন। তার এই নিয়ামত-প্রাপ্তিতে যদি আপনি নাখোশ হোন, যদি সেটা আপনার অন্তরে সংকীর্ণতার প্রকাশ ঘটায়, তাহলে ধরে নিতে হবে আপনার অন্তরে 'হাসাদের' উপস্থিতি আছে। যার অন্তরে হাসাদ আছে সে যে কেবল অন্যের নিয়ামত-প্রাপ্তিতে অখুশি হয় তা নয়, সে মনে মনে প্রত্যাশা করে যে—নিয়ামতগুলো যেন তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় বা সে যেন নিয়ামতগুলো হারিয়ে বসে।

অন্যের ভালো দেখলে মন খচখচ করে না এমন লোক খুঁজে পাওয়াই আজকাল

মুশকিল। তার মানে, মনের এই খচখচানিও কি তাহলে 'হাসাদ' বলে গণ্য হবে? কুরআনের তাফসীরকারকগণ বলেছেন—কেউ যদি কারও উন্নতি বা ভালো দেখে মনে মনে দগ্ধ হয় এবং তা যেন তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় সে প্রত্যাশা করে, তাহলে সেটা হাসাদ বলে গণ্য হবে। তবে অন্যের উন্নতি দেখে কেউ যদি মনে মনে এই প্রত্যাশা করে যে—'আহা! কতোই না সৌভাগ্যবান ওই ব্যক্তি! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি তার মতো আমাকেও ওই নিয়ামত দান করতেন!'—এই ধরনের অভিপ্রায় হাসাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহর মতে—হাসাদের গুনাহ অন্তরের এক মস্তবড় রোগ। কেননা আসমানে সর্বপ্রথম যে গুনাহ সংঘটিত হয় তার উৎপত্তি এই হাসাদ থেকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করে যখন সমস্তকিছুর নাম শিক্ষা দিয়ে ফেরেশতাকূলের সমীপে উপস্থাপন করলেন, তখন আদম আলাইহিস সালামের নিয়ামত-প্রাপ্তিকে ভালোভাবে নিতে পারেনি ইবলীস। সেই 'হাসাদ' তথা হিংসা সে লুকোতে পারেনি। আদম আলাইহিস সালামের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনুগ্রহকে খাটো করতে গিয়ে অহংকারের আশ্রয় নেয় সে। তাকে যখন আদম আলাইহিস সালামকে সিজদাহ করতে বলা হলো, তখন সে তা করতে অস্বীকার করে এবং হয়ে পড়ে চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত।

ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ আরও লিখেছেন—'আসমানে যেমন কৃত প্রথম গুনাহ হাসাদ থেকে, তেমনি জমিনেও প্রথম যে গুনাহ সংঘটিত হয় তা-ও হাসাদ তথা হিংসা থেকে উদগীরিত। জমিনে প্রথম সংঘাত বা পাপের সূচনা করে আদম আলাইহিস সালামের পুত্র কাবিল। আদম আলাইহিস সালামের আরেক পুত্র হাবিলের প্রতি আল্লাহর অপার অনুগ্রহকে কাবিল ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। হিংসার বশবর্তী হয়ে কাবিল একদিন হাবিলকে খুন করে বসে। এটাই জমিনে সংঘটিত হওয়া প্রথম সংঘাত এবং এটার উৎসস্থলও একই—হাসাদ তথা হিংসা।[৫৪]

নিঃসন্দেহে হাসাদ তথা হিংসা আত্মার এক মারাত্মক ব্যাধি। কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটার নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন,

---

৫৪. কুরতুবি, তাফসীর, ৫/২৫১।

> أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ
>
> "আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে লোকদেরকে যে নিয়ামত দান করেছেন, সেগুলোর জন্য এরা কি তাদের হিংসা করে?"[৫৫]

২

সূরা ফালাক তিলাওয়াতকালে প্রতিবারই আমি একটা ধাক্কা খাই। সূরা ফালাকের একেবারে শেষ আয়াতে, কোন জিনিস থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই বলতে পারেন? হিংসুকের হিংসা থেকে। ওই আয়াতে আমরা বলি—

> وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝
>
> "(আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি) হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।"[৫৬]

আমি অবাক হয়ে ভাবি—এই সূরায় মানুষ ক্ষতিকর প্রাণী, কীটপতঙ্গ, অন্ধকারের যা কিছু অনিষ্ট এবং যারা কুফরি-কালাম তথা ব্ল্যাক ম্যাজিক করে তাদের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। একেবারে শেষে এসে বলে—'আমাকে আশ্রয় দিন হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।' যার অন্তরে 'হাসাদ' তথা হিংসা আছে তাকে কুরআন ক্ষতিকর প্রাণী, ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ এবং মানুষের ক্ষতি সাধন করে এমন জাদুকরদের সাথে সমান্তরালে রেখে কথা বলেছে। অর্থাৎ—হিংসুক ব্যক্তি ক্ষতিকর প্রাণী, কীটপতঙ্গ কিংবা জাদুকরদের চেয়ে কম ক্ষতিকর নয়!

ধরুন—আপনার অন্তরে হিংসা আছে। আপনি কারও উন্নতি দেখে সহ্য করতে পারেন না। কারও পদোন্নতি, ভালো অবস্থা দেখলে আপনার মন খচখচ করে। কারও ভালো কোনো অর্জন দেখলে আপনি তা মেনে নিতে পারেন না। মনে মনে আশা করেন—এই অর্জন যেন ধুলোয় পর্যবসিত হয় কিংবা এটাই যেন তার

৫৫. সূরা নিসা, ৪ : ৫৪।

৫৬. সূরা ফালাক, ১১৩ : ০৫।

জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়।

আপনার অন্তরের অবস্থা যদি এরকম হয়, তাহলে সূরা ফালাকের শেষের সেই আয়াত, যে আয়াতে 'হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট' থেকে পানাহ চাওয়া হয়, আপনিও সেই আয়াতের অন্তর্ভুক্তদের একজন। অর্থাৎ—কেউ যখন আল্লাহর কাছে হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট থেকে পানাহ চায়, তখন সে মূলত আপনার থেকেই আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। হিংসা করার মাধ্যমে তার যে ক্ষতি আপনি করে দিতে পারেন, সেই ক্ষতি থেকে সে বাঁচতে চায়।

মানুষেরা রোজ রোজ, সকাল-সন্ধ্যায় প্রার্থনা করে আপনার কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছে—দৃশ্যটা ভাবতে কেমন লাগে আপনার?

'হাসাদ' তথা হিংসা অন্তরের এমন একটা মারাত্মক ব্যাধি যা আমাদেরকে ক্ষতিকর জিন, হিংস্র প্রাণী এবং ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের কাতারে নামিয়ে আনে। এটা মানুষকে এমন স্তরে নামিয়ে আনে, যে স্তরে নেমে আসার পর অন্য মানুষদের আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া লাগে তার ক্ষতি থেকে বাঁচতে।

৩

কারও নিয়ামত-প্রাপ্তিতে, কিংবা কারও সুখ আর উন্নতি দেখলে আমাদের কী করা উচিত তারও একটা চমৎকার নজির কুরআনে আছে। সূরা আ-ল ইমরানের শুরুর দিকে আমরা দেখি—মারইয়াম আলাইহাস সালামের মেহরাবে তাঁর খালু যাকারিয়া আলাইহিস সালাম এসে নানান ধরনের ফলমূল দেখে বিস্মিত হয়ে যেতেন। এমন ফলমূল, যেগুলোর মৌসুম অনেক আগেই গত হয়েছে বা যেগুলো তিনি নিজেও কখনো দেখেননি। একদিন তিনি জিগ্যেশ করেই বসলেন, 'মারইয়াম, এগুলো তুমি কোথায় পাও?'

যাকারিয়া আলাইহিস সালামের এই প্রশ্নের জবাবে মারইয়াম আলাইহাস সালাম বললেন,

هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

"এগুলো আমার রবের পক্ষ থেকে আসে। নিশ্চয় তিনি যাকে ইচ্ছে বেহিশেব রিয্ক দান করেন।"(৫৭)

আল্লাহর পক্ষ থেকে মারইয়াম আলাইহাস সালাম এই যে অনুগ্রহ পাচ্ছেন, এটা দেখে যাকারিয়া আলাইহিস সালাম কিন্তু হিংসায় ফেটে পড়েননি। তিনি নিজে একজন নবি ছিলেন। তাঁর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এসব ফলফলাদি না পাঠিয়ে কেন মারইয়ামের জন্য পাঠান—এমন অভিযোগও তিনি আল্লাহর কাছে করে বসেননি। তিনি কী করেছেন, জানেন?

যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ছিলেন নিঃসন্তান। তিনি নিজে একেবারে বয়োবৃদ্ধ, তারওপর তাঁর স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা। সন্তান লাভের আর কোনো উপায় তাঁর অবশিষ্ট থাকলো না। কিন্তু সেদিন মারইয়াম আলাইহাস সালামের মেহরাবে এমন সব অদ্ভুত এবং অ-মৌসুমের ফলমূল দেখে তাঁর মনে হলো—গত হয়ে যাওয়া মৌসুমের ফলমূল যদি মারইয়াম এখন পেতে পারে, তাহলে এই বৃদ্ধাবস্থায় এবং স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব অবস্থাতেও তো আমি সন্তান পেতে পারি। যে রব মারইয়ামকে এই নিয়ামত দেন, তিনি তো আমাকেও দিতে পারেন।

এই ভাবনা থেকে যাকারিয়া আলাইহিস সালাম সাথে সাথে মারইয়াম আলাইহাস সালামের মেহরাবে থাকাবস্থাতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দুআ করলেন। সেই দুআটাও সূরা আ-ল ইমরানে জায়গা পেয়েছে। তিনি বলেছেন :

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

"হে আমার রব! আমাকে আপনার পক্ষ হতে একটি উত্তম সন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।"(৫৮)

মারইয়াম আলাইহাস সালামের নিয়ামত-প্রাপ্তি যাকারিয়া আলাইহিস সালামের মনে হাসাদ তথা হিংসার উদ্রেক করেনি; বরং তাঁর মনে জাগিয়ে দিয়েছে বয়োবৃদ্ধ অবস্থায় সন্তান লাভের ইচ্ছা। কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন—

---

৫৭. সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৩৭।

৫৮. সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৩৮।

দুআ কবুলের একটা উত্তম মুহূর্ত হচ্ছে কাউকে নিয়ামত-প্রাপ্ত হতে দেখা বা কারও নিয়ামত-প্রাপ্তির সংবাদ শোনামাত্র নিজের জন্যও দুআ করা, যেভাবে দুআ করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নবি যাকারিয়া আলাইহিস সালাম।[৫৯]

কাউকে ব্যবসাতে উন্নতি করতে দেখলে মনে মনে আল্লাহকে বলেন, 'ইয়া রব! তাকে যেভাবে অবারিত রিয্ক আপনি দিচ্ছেন, সেভাবে আমাকেও দিন।'

কারও সংসারে সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যের সমারোহ দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়ার বদলে আল্লাহকে বলেন, 'মালিক, সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার মালিক তো কেবল আপনি। তার মতো করে আমার সংসারেও আপনি অঢেল সুখ দান করেন।'

কারও বাচ্চা ভালোভাবে বেড়ে উঠছে, কেউ ভালো চাকুরি পেয়েছে, কারও জীবনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অবারিত বারাকাহ আসছে—এসব দেখে নিজেকে নিয়ে হতাশ হয়ে পড়া এবং ওই ব্যক্তিকে হিংসা করাটা অসুস্থ অন্তরের স্বাক্ষর বহন করে। আমাদেরকে হতে হবে যাকারিয়া আলাইহিস সালামের মতো—কাউকে নিয়ামত পেতে দেখলে আমরা বরং খুশি হবো। আমাদের অন্তরে অন্তরে ছড়িয়ে দেবো তাকওয়া আর তাওয়াক্কুলের পারদ।

ফিরআউন সিনড্রোম

১

কতো কতোবার ফিরআউনের কাছে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে গেলেন মূসা আলাইহিস সালাম। কিন্তু ফিরআউন তার সমস্ত ঔদ্ধত্য, সমস্ত অহংকারকে বিজয়ী করতে বরাবরই মূসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে গেছে। তা করেই সে ক্ষান্ত হয়নি। বনি ইসরাঈল, যারা মূসা আলাইহিস সালামের রবকে বিশ্বাস করতো এবং তাঁর আনুগত্য করতো—তাদের ওপর হেন কোনো নির্যাতন নেই, যা ফিরআউন করেনি।

ফিরআউনের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত হলো—তাকে এবং তার সমস্ত সভাসদকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হবে। আল্লাহর একত্ববাদকে বারংবার অস্বীকার, আল্লাহর নবিকে লাঞ্ছিত করা, আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দাদের অত্যাচার-নির্যাতন করা—এসবের দুনিয়াবি বদলা হিশেবে তাকে সমুদ্রের অতলে তলিয়ে দেওয়া হবে। চুরমার করা হবে তার সমস্ত অহংকার আর আভিজাত্যকে।

আল্লাহর নির্দেশে মূসা আলাইহিস সালাম অনুগত বনি ইসরাঈলিদের নিয়ে সমুদ্র পাড়ে চলে এলেন। সম্মুখে অথৈ জল আর পেছনে বিশাল বাহিনী নিয়ে ছুটে আসছে ফিরআউন। এ যেন ডাঙায় বাঘ আর জলে কুমিরের মতো অবস্থা!

কীভাবে পার হবেন মূসা আলাইহিস সালাম এই পথ, কীভাবে তিনি জালিম, নির্দয় ফিরআউনের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন বনি ঈসরাইলিদের—ভাবনার এমন দোলাচলে তাঁকে পথ বাতলালেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। মূসা আলাইহিস সালামকে তিনি বললেন, 'হাতে থাকা লাঠিটা দিয়ে পানিতে আঘাত করুন।'

ঠিক তা-ই করলেন মূসা আলাইহিস সালাম। আল্লাহর নির্দেশ লাভের সাথে সাথে নিজের হাতে থাকা লাঠিটা দিয়ে আঘাত করলেন সমুদ্রের বুকে। আল্লাহর কী অপার মহিমা! অকস্মাৎ সমুদ্রের বুক ফুঁড়ে দৃশ্যমান হয়ে উঠলো কতোগুলো রাস্তা! সুবহানাল্লাহ! মূসা আলাইহিস সালামের ঈমান তখন কোথায় গিয়ে ঠেকলো, ভাবতে পারেন?

সমুদ্রের বুকে মূসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর শিষ্যদের জন্য পথ তৈরি করে দিয়েছেন মহান রব। একটু আগেও যেখানে অথৈ জলের ধারা ছিলো, সেখানে এখন হেঁটে পার হয়ে যাওয়ার মতো শুষ্ক, নিরুপদ্রব পথের আবির্ভাব। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মূসা আলাইহিস সালাম সেই পথগুলো ধরে এগুতে লাগলেন। পেছনে ধেয়ে আসছে প্রতাপশালী জালিম ফিরআউন।

খুব সুন্দরমতোই পথগুলো ধরে সমুদ্রের অন্য পাড়ে চলে এলেন মূসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর বাহিনী। খানিক বাদে ফিরআউন বাহিনীও সমুদ্রের পাড়ে চলে এলো। সমুদ্রের পাড়ে এসে ফিরআউন দেখলো—আহা! সমুদ্রের বুকে কী সুন্দর রাস্তা! কী জানি—সে হয়তো তখন মূসা আলাইহিস সালামকে খানিকটা বোকাও ভেবে থাকতে পারে।

সে হয়তো ভেবেছে—'কী বোকা এই লোকটা! জাদুবলে (যেহেতু সে মূসা আলাইহিস সালামকে একজন জাদুকর-ই মনে করতো) একটা নৌকা বানিয়ে পার হয়ে গেলেই পারতো। কিন্তু তা না করে সমুদ্রের ওপর পথ তৈরি করে রেখে গেলো। সে কি বুঝলো না যে—তার বানানো পথ ধরে আমি তাকে ধাওয়া করতে পারি? হিহিহি।'

ফিরআউন ভেবেছে যে পথ ধরে মূসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর বাহিনী সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন, ওই একই পথ ধরে সে এবং তার বাহিনীও পার হয়ে যেতে পারবে। কিন্তু সে যে ক্রমশ তার মৃত্যুফাঁদের দিকে এগিয়ে চলেছে—তা বুঝবার মতো পরিস্থিতি তখন আর ছিলো কই? সে ছিলো প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত। মূসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সমস্ত অনুগত শিষ্যদের হত্যা করাটাই তখন তার জীবনের প্রধানতম ব্রত।

ফিরআউন মনের আনন্দে তার সমস্ত সভাসদকে সাথে নিয়ে সমুদ্রের সেই পথ ধরে এগুতে লাগলো। যখন মাঝসমুদ্রে চলে এলো তারা, আল্লাহর

নির্দেশে সমুদ্রের পানি দুই দিক থেকে প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে আসতে শুরু করলো। ফিরআউনের আর বুঝতে বাকি রইলো না যে কী ভুল সে করে বসেছে! আর একটুবাদেই সে এই সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যাবে। নিশ্চিহ্ন হবে তার সমস্ত আভিজাত্য! দুমড়ে মুচড়ে পড়বে তার সমস্ত অহংকার!

ডুবন্ত মানুষ খড়কুটো ধরে হলেও বাঁচতে চায়। বেঁচে থাকার তাগিদে শেষ চেষ্টাটুকু অন্তত করে মানুষ। ফিরআউনও তার ব্যতিক্রম ছিলো না। সে বুঝে গেছে—এতোদিন যাকে সে অস্বীকার করেছে, সেই মূসার রব ছাড়া আজকে আর তার কোনো উদ্ধারকারী নেই, আর নেই কোনো পরিত্রাণকারী। কেবল তিনিই পারেন আজকের এই মহা-বিপদ থেকে তাকে বাঁচাতে।

সেদিন ওই মুহূর্তে, ডুবে যাওয়ার খানিকটা আগে সর্বশেষ চেষ্টা হিশেবে ফিরআউন আহাজারি করে যা বলেছে, তা সূরা ইউনুসে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। সমুদ্রের পানিতে তলিয়ে যাওয়ার একটু আগে সে বলতে শুরু করেছে—

آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾

> "আমি ঈমান আনছি যে, তিনি ছাড়া আর সত্যিকারের কোনো মাবুদ নেই, যার প্রতি বনি ইসরাঈলিরা ঈমান এনেছে। আর আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"(৬০)

ফিরআউন ভেবেছে—ঈমান এনেছি বললেই তার এই বিপদ কেটে যাবে, মাফ হয়ে যাবে তার এতোদিনের সকল কু-কীর্তি, সকল অনাচার! হয়তো মাফ হতো—তবে তা যদি সে অন্তর থেকে বলতো আর বিশ্বাস করতো। কিন্তু তার শেষ আহাজারির দিকে খেয়াল করুন। জীবনের একেবারে অন্তিম মুহূর্ত চলছে তার। একটুপরে বিশাল ঢেউয়ের তলায় হারিয়ে যাবে সে। তার আগে শেষবারের মতো নিজের পাপ স্বীকার করে ক্ষমা চাচ্ছে, তাতেও সে ছাড়তে পারলো না অহংকারের খোলস। বের হতে পারলো না নিজের আমিত্বের বৃত্ত থেকে।

সে ওই আহাজারিতে বললো—'আমি ঈমান আনছি তার প্রতি, যার প্রতি ঈমান এনেছে বনি ইসরাঈলিরা।'

---

৬০. সূরা ইউনুস, ১০ : ৯০।

'আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনছি'—এটুকু বললেই কিন্তু যথেষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু সেটা না বলে সে ঘুরিয়ে পেছিয়ে বলেছে—'আমি ঈমান আনছি তার প্রতি, যার প্রতি ঈমান এনেছে বনি ঈসরাইলিরা।'

সারাটা জীবন সে আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করেছে। হেন কোনো অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার নেই যা সে করেনি। মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে ছেড়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নবিকে কষ্ট দিয়েছে, খুন করতে চেয়েছে। এতদসত্ত্বেও জীবনের শেষ মুহূর্তে যখন নিজের ভুল থেকে ফিরতে চাইছে, তখনো অহংকারের চাদর গা থেকে ফেলতে পারেনি সে। মুখ দিয়ে 'আল্লাহ' শব্দটা উচ্চারণ করতে ওই সময়েও তার মনে কাজ করছে অহংকার আর ঔদ্ধত্য। যার বিরুদ্ধে গিয়ে কেটেছে জীবন, যাদের সামনে জীবনের সমস্ত শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করেছে আজীবন, যে অনুগত দলের সামনে নিজেকে 'খোদা' দাবি করেছে এতোদিন, আজ তাদের সকলের সামনে তাঁর নাম উচ্চারণ করে তাঁর কাছে সাহায্যের হাত পাততে বড়ই আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগছে তার! সুতরাং, 'আমি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি' নয়, বরং 'আমি ঈমান এনেছি তার প্রতি, যার প্রতি ঈমান এনেছে বনি ইসরাঈল সম্প্রদায়' বলেই সে দায়মুক্তি পেতে চেয়েছে।

অহংকারের একটা সীমা পরিসীমা থাকে, কিন্তু ফিরআউন সেই সীমা পরিসীমাকে ছাড়িয়ে কোন অসীমে যে চলে গেছে, সে নিজেও জানে না। অহংকারীর পতন যে অনির্বায—ফিরআউন তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ।

২

এই যে ফিরআউন তার ডুবতে থাকা সভাসদদের সামনেও 'আল্লাহ' শব্দটা মুখে উচ্চারণ করতে পারলো না, এর কারণ কী? সে হয়তো ভেবেছে—যদি কোনোভাবে সেদিনের সে বিপর্যয়, সে মহা-বিপদ থেকে সে বেঁচে যেতে পারে, তাহলে তার সভাসদ, ভক্ত-অনুসারীদের কাছে তাকে যেন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে না হয় যে—'যে শব্দের অস্তিত্ব দুনিয়া থেকে 'নাই' করার কাজে গোটা জীবন ব্যয় করেছেন, শেষমেশ সেই শব্দের দ্বারস্থ আপনাকে হতেই হলো!' মোদ্দাকথা ফিরআউন হয়তো ভেবেছিলো—'আল্লাহ' শব্দ উচ্চারণ বুঝি তার গ্রহণযোগ্যতা কমিয়ে দিতে পারে তার ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষী-অনুসারী মহলে। তাই

নির্দেশে সমুদ্রের পানি দুই দিক থেকে প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে আসতে শুরু করলো। ফিরআউনের আর বুঝতে বাকি রইলো না যে কী ভুল সে করে বসেছে! আর একটুবাদেই সে এই সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যাবে। নিশ্চিহ্ন হবে তার সমস্ত আভিজাত্য! দুমড়ে মুচড়ে পড়বে তার সমস্ত অহংকার!

ডুবন্ত মানুষ খড়কুটো ধরে হলেও বাঁচতে চায়। বেঁচে থাকার তাগিদে শেষ চেষ্টাটুকু অন্তত করে মানুষ। ফিরআউনও তার ব্যতিক্রম ছিলো না। সে বুঝে গেছে—এতোদিন যাকে সে অস্বীকার করেছে, সেই মূসার রব ছাড়া আজকে আর তার কোনো উদ্ধারকারী নেই, আর নেই কোনো পরিত্রাণকারী। কেবল তিনিই পারেন আজকের এই মহা-বিপদ থেকে তাকে বাঁচাতে।

সেদিন ওই মুহূর্তে, ডুবে যাওয়ার খানিকটা আগে সর্বশেষ চেষ্টা হিশেবে ফিরআউন আহাজারি করে যা বলেছে, তা সূরা ইউনুসে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। সমুদ্রের পানিতে তলিয়ে যাওয়ার একটু আগে সে বলতে শুরু করেছে—

آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝٩٠

> "আমি ঈমান আনছি যে, তিনি ছাড়া আর সত্যিকারের কোনো মাবুদ নেই, যার প্রতি বনি ইসরাঈলিরা ঈমান এনেছে। আর আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"[৬০]

ফিরআউন ভেবেছে—ঈমান এনেছি বললেই তার এই বিপদ কেটে যাবে, মাফ হয়ে যাবে তার এতোদিনের সকল কু-কীর্তি, সকল অনাচার! হয়তো মাফ হতো—তবে তা যদি সে অন্তর থেকে বলতো আর বিশ্বাস করতো। কিন্তু তার শেষ আহাজারির দিকে খেয়াল করুন। জীবনের একেবারে অন্তিম মুহূর্ত চলছে তার। একটুপরে বিশাল ঢেউয়ের তলায় হারিয়ে যাবে সে। তার আগে শেষবারের মতো নিজের পাপ স্বীকার করে ক্ষমা চাচ্ছে, তাতেও সে ছাড়তে পারলো না অহংকারের খোলস। বের হতে পারলো না নিজের আমিত্বের বৃত্ত থেকে।

সে ওই আহাজারিতে বললো—'আমি ঈমান আনছি তার প্রতি, যার প্রতি ঈমান এনেছে বনি ইসরাঈলিরা।'

---

৬০. সূরা ইউনুস, ১০ : ৯০।

'আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনছি'—এটুকু বললেই কিন্তু যথেষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু সেটা না বলে সে ঘুরিয়ে পেছিয়ে বলেছে—'আমি ঈমান আনছি তার প্রতি, যার প্রতি ঈমান এনেছে বনি ঈসরাইলিরা।'

সারাটা জীবন সে আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করেছে। হেন কোনো অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার নেই যা সে করেনি। মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে ছেড়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নবিকে কষ্ট দিয়েছে, খুন করতে চেয়েছে। এতদসত্ত্বেও জীবনের শেষ মুহূর্তে যখন নিজের ভুল থেকে ফিরতে চাইছে, তখনো অহংকারের চাদর গা থেকে ফেলতে পারেনি সে। মুখ দিয়ে 'আল্লাহ' শব্দটা উচ্চারণ করতে ওই সময়েও তার মনে কাজ করছে অহংকার আর ঔদ্ধত্য। যার বিরুদ্ধে গিয়ে কেটেছে জীবন, যাদের সামনে জীবনের সমস্ত শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করেছে আজীবন, যে অনুগত দলের সামনে নিজেকে 'খোদা' দাবি করেছে এতোদিন, আজ তাদের সকলের সামনে তাঁর নাম উচ্চারণ করে তাঁর কাছে সাহায্যের হাত পাততে বড়ই আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগছে তার! সুতরাং, 'আমি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি' নয়, বরং 'আমি ঈমান এনেছি তার প্রতি, যার প্রতি ঈমান এনেছে বনি ইসরাঈল সম্প্রদায়' বলেই সে দায়মুক্তি পেতে চেয়েছে।

অহংকারের একটা সীমা পরিসীমা থাকে, কিন্তু ফিরআউন সেই সীমা পরিসীমাকে ছাড়িয়ে কোন অসীমে যে চলে গেছে, সে নিজেও জানে না। অহংকারীর পতন যে অনির্বায—ফিরআউন তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ।

২

এই যে ফিরআউন তার ডুবতে থাকা সভাসদদের সামনেও 'আল্লাহ' শব্দটা মুখে উচ্চারণ করতে পারলো না, এর কারণ কী? সে হয়তো ভেবেছে—যদি কোনোভাবে সেদিনের সে বিপর্যয়, সে মহা-বিপদ থেকে সে বেঁচে যেতে পারে, তাহলে তার সভাসদ, ভক্ত-অনুসারীদের কাছে তাকে যেন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে না হয় যে—'যে শব্দের অস্তিত্ব দুনিয়া থেকে 'নাই' করার কাজে গোটা জীবন ব্যয় করেছেন, শেষমেশ সেই শব্দের দ্বারস্থ আপনাকে হতেই হলো!' মোদ্দাকথা ফিরআউন হয়তো ভেবেছিলো—'আল্লাহ' শব্দ উচ্চারণ বুঝি তার গ্রহণযোগ্যতা কমিয়ে দিতে পারে তার ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষী-অনুসারী মহলে। তাই

সে 'বনি ইসরাঈলিরা যার প্রতি ঈমান এনেছে' বলতে পেরেছে; কিন্তু আরও সহজ, স্পষ্টভাবে 'আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি' বলতে পারেনি।

আজকের সমাজে, আমাদের চারপাশেও কতিপয় মানুষ আছেন, যারা 'আল্লাহ' শব্দ উচ্চারণ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন। তারা ভাবেন—কথার মধ্যে বা লেখার মধ্যে 'আল্লাহ' শব্দ ব্যবহার করলে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বুঝি হুমকির মুখে পড়ে যাবে। যে কমিউনিটিতে তারা 'বিলং' করেন বলে মনে করেন, সেখানে বোধহয় তারা 'ব্রাত্য' হয়ে পড়বেন যদি তারা 'আল্লাহ', 'কুরআন', 'নামায' ইত্যাদি শব্দ বলেন বা লেখায় আনেন। তাদের এই ব্যাধিকে আমি বলি 'ফিরআউন সিনড্রোম।' গ্রহণযোগ্যতা হারানোর ভয়ে হোক কিংবা অহংকারের বশে—ডুবে যাওয়ার আগেও ফিরআউন যেভাবে 'আল্লাহ' শব্দ মুখে আনতে পারেনি, আমাদের সমাজের এই মানুষগুলোরও হয়েছে একই দশা। নিজেদের তথাকথিত গ্রহণযোগ্যতা হারানোর ভয়ে হোক কিংবা অহংকারের বশে, তারা 'আল্লাহ' শব্দের বদলে বলেন 'সৃষ্টিকর্তা', 'নামায' শব্দের বদলে বলেন 'প্রার্থনা', 'দুআ' না বলে তারা বলেন 'আশীর্বাদ' ইত্যাদি।

ফিরআউন তো ডুবে মরেছে তার অহংকার সমেত, আমাদের চারপাশের মানুষগুলোর এই আইডেন্টিটি ক্রাইসিস কিংবা অহংকারের প্রলেপ অথবা গ্রহণযোগ্যতা হারানোর ভয়—জীবনের বেলা ফুরিয়ে আসার আগেই যাতে তাদের বোধোদয় হয় সেই কামনা ব্যক্ত করি।

৩

মূসা আলাইহিস সালাম এবং ফিরআউনের এই ঘটনা পরম্পরা কুরআন থেকে পড়তে গিয়ে আরও একটা জায়গায় আমার চোখ আটকালো। সূরা আদ-দুখানের শুরুর দিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মূসা আলাইহিস সালামের সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার ঘটনা এবং ফিরআউনকে ডুবিয়ে মারার ঘটনা বিবৃত করেছেন।

ফিরআউনের হাত থেকে বাঁচতে নিজের অনুসারীদের নিয়ে হিজরত করতে গিয়ে মূসা আলাইহিস সালাম এসে পড়েন এক অকূল সমুদ্রের সামনে। সমুদ্রে নেই কোনো বাহন যাতে চড়ে তারা পাড়ি জমাতে পারেন অদূরে, চলে যেতে পারেন

ফিরআউন বাহিনীর একেবারে নাগালের বাইরে। অন্যদিকে তাদেরকে ধাওয়া করতে থাকা ফিরআউন বাহিনীও নিকটবর্তী প্রায়! এমতাবস্থায় কী করবেন মূসা আলাইহিস সালাম? পথ বাতলালেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। হাতে থাকা লাঠিটা দিয়ে সমুদ্রের পানিতে আঘাত করতে বললেন মূসা আলাইহিস সালামকে। তিনি লাঠি দিয়ে সমুদ্রের পানিতে আঘাত করলেন এবং আল্লাহর অপার মহিমায় সমুদ্রের বুক ফুঁড়ে তাদের জন্য পথ তৈরি হলো। সেই পথ ধরে মূসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর অনুসারীরা সমুদ্র পাড়ি দিলেন।

এখন?

সমুদ্রের এই প্রান্তে ফিরআউন বাহিনী, আর অপরপ্রান্তে মূসা আলাইহিস সালাম এবং বনি ইসরাঈলিরা। মাঝখানে সমুদ্র এবং তাতে এখনো সেই পথগুলো দৃশ্যমান, যা ধরে মূসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর অনুসারীরা সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন। আল্লাহর তৈরি করে দেওয়া সেই পথগুলো তখনো মুছে যায়নি।

এই পথগুলো যদি এভাবে থেকে যায়, তাহলে ফিরআউন এবং তার বাহিনী এই পথ ধরে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দেবে এবং পুনরায় ধাওয়া করবে মূসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর অনুসারীদের—এই ভয়টা কি অমূলক? একদম নয়। মূসা আলাইহিস সালামও এই ভয়টা পাচ্ছিলেন তখন। তিনি ভাবছিলেন—দ্রুত যদি এই পথগুলো সমুদ্র-গর্ভে বিলীন না হয়, তাহলে জালিম ফিরআউন আর তার বাহিনী একই পথ ধরে এগিয়ে আসবে এবং তাদের আক্রমণ করে বসবে। এই চিন্তা থেকেই মূসা আলাইহিস সালাম ভাবলেন—আল্লাহর ইচ্ছাতে যেহেতু লাঠির স্পর্শে সমুদ্রে পথ তৈরি হয়েছে, পুনরায় সেই লাঠির স্পর্শেই হয়তো পথগুলো আবার বিলীন হয়ে যাবে। এ-ধরনের ধারণা থেকে তিনি হয়তো হাতের ওই লাঠি দ্বারা সমুদ্রের পানিতে আবার আঘাত করেছেন অথবা করার কথা ভাবছিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মূসা আলাইহিস সালামকে বললেন,

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾

"সমুদ্রকে স্থির থাকতে দিন। ওরা এমন এক বাহিনী, যারা নিমজ্জিত হবে।"[৬১]

৬১. সূরা দুখান, ৪৪ : ২৪।

আয়াতে আল্লাহর কথাটা খেয়াল করুন—'সমুদ্রকে স্থির থাকতে দিন।'

যে পথ ধরে মূসা আলাইহিস সালাম সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন, সেই পথটা যদি থেকে যায়, ফিরআউন বাহিনীও ওই পথ ধরে এগিয়ে আসবে এবং এতে মূসা আলাইহিস সালামদের বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না—এটা খুব স্বাভাবিক চিন্তা। এই চিন্তায় তাড়িত হয়ে মূসা আলাইহিস সালাম ভাবছিলেন কী করে সমুদ্রের মাঝে তৈরি হওয়া পথগুলোকে বিলীন করে দেওয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন—সমুদ্রের মাঝে তৈরি হওয়া পথের ব্যাপারে আপনার বিচলিত হওয়ার দরকার নেই। সেগুলো সেগুলোর মতোই থাকুক। আর ফিরআউন বাহিনীর ফায়সালাও হয়ে গেছে। তাদেরকে নিশ্চিতভাবেই ডুবিয়ে মারা হবে।

মূসা আলাইহিস সালাম চাচ্ছিলেন না ওই পথগুলো ধরে ফিরআউন বাহিনী আগাক। কিন্তু সেই পথগুলো ধরে আগানোর মাঝেই যে তাদের জন্য বিপদ লুকিয়ে রাখা হয়েছে—তা বুঝতে পারেননি মূসা আলাইহিস সালাম।

মানুষের সাথে অন্যায় করে, অবিচার করে, জুলুম করেও অনেককে আমরা খুব ফুর্তিতে দিনযাপন করতে দেখি। আমরা দেখি—এতো অন্যায়-অনাচারের পরেও তাদের জীবনের কোথাও যেন কোনো ছন্দপতন নেই। যেন তাদের চারপাশে কেবল সুখ আর সুখ। এমন অবস্থা দেখে আমাদের মনে হতে পারে—আহা! এতো অবিচার-অনাচারের কি কোনো বিচার হবে না? কোনো শাস্তিই কি পাবে না এই জালিমেরা?

আমাদের মানবীয় দৃষ্টিকোণ এবং গভীর দুঃখবোধ থেকে এ-ধরনের চিন্তা আসা স্বাভাবিক। তবে সূরা আদ-দুখানের এই আয়াত আমাকে সেই ভাবনাটাকে পুনর্বিবেচনা করার সাহস জুগিয়েছে অনেক বেশি। আল্লাহর তৈরিকৃত পথ ধরে কিছুদূর এগিয়ে আসাটা ছিলো ফিরআউন বাহিনীর জন্য খানিকটা অবকাশ। তবে ক্ষণিক বাদেই তাদের ওপর যখন সমুদ্র তার প্রলয়ংকরী রূপ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো—সেটা ছিলো তাদের জন্য দুনিয়ার বুকে চূড়ান্ত শাস্তি।

মানুষের সাথে অন্যায়-অবিচার করেও যারা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়, যারা গড়ে তোলে বিশাল বিশাল অট্টালিকা আর সম্পদের পাহাড়—তাদের এই সুখ-যাপন দেখে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। হতে পারে এই সুখ ধ্বংস হওয়ার

আগে তাদের জন্য সেই অবকাশ, যে অবকাশ পেয়েছিলো ফিরআউন এবং তাঁর বাহিনী সমুদ্রের পথ ধরে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার মতো। হতে পারে এই সুখের রাস্তা তাদেরকে টেনে নিয়ে যাবে অন্তিম আর অনন্ত ধ্বংসস্তূপের কাছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মূসা আলাইহিস সালামকে বলেছিলেন—'সমুদ্রকে স্থির থাকতে দিন।' যেন এই আয়াতে তিনি আমাদেরকেই বলছেন, তাদেরকে তাদের দিনগুলো কাটাতে দাও। তাদের করে নিতে দাও মৌজ-মাস্তি। তাদের ফায়সালা তো তৈরিই আছে।

জালিমের কোনো অন্যায় আর অবিচার আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না। তাদের ফায়সালা তো আল্লাহর হাতে তৈরিই আছে, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না। এই বুঝতে না পারার কারণে তারা যে নিশ্চিন্তির জীবন কাটায়—এই অবকাশটুকু আল্লাহ তাদেরকে দিয়ে থাকেন এই জন্য যে, যাতে তাদের ধ্বংসটাও শোচনীয় হয়। তাদের নিশ্চিন্তির জীবন দেখে হতাশ হবেন না; বরং তাদের আশু-ধ্বংসের দৃশ্যের কথা ভেবে আল্লাহর শোকর আদায় করুন।

জীবনের বেলা শেষে

১

আগের অধ্যায়ে সূরা আদ-দুখান থেকে ফিরআউন বাহিনীর সমুদ্রের অতলে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনা জেনেছিলাম আমরা। সেই ঘটনা-পরম্পরায় ফিরআউনকে নিয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও কিছুদূর আলোচনা করেছেন উক্ত সূরাতেই। ফিরআউন এবং তার বাহিনীকে ডুবিয়ে দেওয়ার পরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

> فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴿٢٩﴾
>
> "আসমান এবং জমিন তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তাদেরকে দেওয়া হয়নি একটু অবসরও।"[৬২]

ফিরআউন বাহিনী যখন ডুবে মরলো, তখন তাদের জন্য আসমান আর জমিন একটুও কাঁদেনি—এটাই হচ্ছে এই আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু কেনই বা এখানে আসমান আর জমিনের কাঁদবার কথা বলা হলো? কারও মৃত্যুতে কি আসমান আর জমিন আসলেই কাঁদে?

তাফসীর ইবনু কাসীরে এসেছে, সাঈদ ইবনু যুবাইর রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—'একবার একলোক ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কাছে এসে জিগ্যেশ করলেন, 'ওহে আল-আব্বাসের পিতা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে বলেছেন—"আসমান এবং জমিন তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তাদেরকে দেওয়া হয়নি একটু অবসরও।" কিন্তু আসমান আর জমিন কি সত্যিই

---

৬২. সূরা দুখান, ৪৪ : ২৯।

কারও জন্য কাঁদে?' জবাবে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেন—'হ্যাঁ, দুনিয়াতে এমন কেউ নেই যার জন্য আসমানে একটা দরোজা বরাদ্দ রাখা হয়নি। সেই দরোজাগুলো দিয়ে আসমান থেকে ব্যক্তির রিযক জমিনে আসে এবং ব্যক্তির আমল ওই দরোজা দিয়েই আসমানে উত্থিত হয়। যখন কোনো মুমিন ব্যক্তি মারা যায়, সাথে সাথে সেই দরোজাটা বন্ধ হয়ে যায়। সেই দরোজা তখন আফসোস করে আর মুমিন ব্যক্তির জন্য কান্না করে। এবং জমিনের যে জায়গায় ওই মুমিন ব্যক্তি সালাত আদায় করতো—সেই জায়গাটাও তার জন্য কান্না করে। কিন্তু ফিরআউন এবং তার বাহিনীর এমন কোনো আমল ছিলো না। তাদের না কোনো ভালো আমল ছিলো, যা আসমানের দরোজা দিয়ে উত্থিত হতো, আর না জমিনের কোথাও তারা সিজদাহবনত হয়েছে কখনো, যার জন্য জমিন তাদের জন্য অশ্রু ঝরাবে।'[৬৩]

২

চলুন, একান্ত অবসরে বসে আমরা একটু কল্পনা করার চেষ্টা করি দৃশ্যটা। দুনিয়াতে আমি যে ভালো কাজগুলো করেছি, হোক তা কম কিংবা বেশি, আসমানের নির্দিষ্ট একটা দরোজা দিয়ে তা আল্লাহর কাছে পৌঁছায়। ওই নির্দিষ্ট দরোজাটা কেবল আমার একার—আর কারও না। শুধু তো আমল নয়, আমার জন্য যে রিযক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নির্ধারণ করেছেন, তা-ও আসমানের ওই দরোজা দিয়ে পৃথিবীতে নেমে আসে। ওই দরোজাটা আমাকে চিনে, আমার নাম জানে। আমি যখন ভালো আমল করি, মানুষের বিপদে সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাই, মানুষের সাথে ভালো আচরণ করি, আমি যখন অশ্লীলতাকে পরিহার করে চলি, যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নাযিলকৃত বিধানকে আমি নিজের জীবনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিই—আসমানের সেই দরোজা তখন খুশি হয়ে যায়। হয়তো-বা ঠিক সেরকম, যেরকম আমাদের ভালো ফলাফলে, ভালো অর্জনে খুশি হয়ে পড়েন আমাদের বাবা-মা। আমরা বিপথে গেলে, অসৎ সঙ্গ আর অনিয়মের বেড়াজালে আটকে গেলে আমাদের বাবা-মা'রা যেভাবে ব্যথিত হন, ঠিক সেভাবে আমরা যখন গুনাহ করি, মন্দ কাজে জড়িয়ে পড়ি, যখন

৬৩. ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/২৫৪; তাবারি, তাফসীর, ২১/৪২; সুয়ূতি, আদ-দুররুল মানসূর, ৭/৪১১।

আল্লাহর বিধানকে ছেড়ে আমরা পা বাড়াই কু-প্রবৃত্তির বাতলানো পথে, তখন কি আসমানের সেই দরোজা ব্যথিত হয় না? দুঃখ পায় না? আমাদের ভালো কাজে, ভালো আমলে যদি সেটা আনন্দিত হয়, মন্দ কাজ আর মন্দ আমলে ব্যথিত হবে—সেটাই তো স্বাভাবিক।

ঘরের সেই কোণ আর মসজিদের সেই স্থান, যেই স্থানে দুনিয়াতে আমরা সালাত আদায় করতাম, আমাদের জায়নামায বিছানোর সেই চির পরিচিত জায়গাটাও মৃত্যুর দিন আমাদের জন্য কাঁদবে। সে কাঁদবে, কারণ—তার ওপর দাঁড়িয়ে, বসে এতোদিন একজন লোক মহামহিম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে স্মরণ করতো, কিন্তু আজ থেকে সেই চিরাচরিত নিয়ম বন্ধ হয়ে গেছে। জমিনের দুঃখ পাওয়ার, ব্যথিত হওয়ার কারণ এটাই যে—তার ওপর দাঁড়িয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এমন এক ব্যক্তির আজ জীবনাবসান ঘটেছে। আর কেউ হয়তো তার বুকে কপাল লাগিয়ে গুনগুন করে বলবে না—সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা।

ফিরআউন এবং তার বাহিনী জীবনে এমন কোনো নজির রেখে যেতে পারেনি। জমিনে কোনোদিন তারা কপাল ঠোকেনি। কোনোদিন কোথাও দাঁড়িয়ে কিংবা বসে উচ্চারণ করেনি আল্লাহর কোনো প্রশংসাবাক্য। মুমিন ব্যক্তি যদি দুনিয়াতে কোনো আপনজন, কোনো বন্ধু-হিতাকাঙ্ক্ষী, কোনো সুহৃদ-শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে না-ও যেতে পারে, তথাপি তার জন্য কাঁদবার দুটো জায়গা আছে—জমিনের সেই অংশ যে অংশে সে কপাল ঠুকে সিজদাহ করতো মহান রাব্বুল আলামীনকে, আর আসমানের সেই দরোজা যে দরোজা দিয়ে তার রিযক আসতো এবং উত্থিত হতো তার আমলগুলো। বিদায়বেলায় তার জন্য কেউ কাঁদুক কিংবা না-কাঁদুক, এই দুটো বস্তু তার জন্য কাঁদবে, মনে খারাপ করবে, ব্যথিত হবে। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য ফিরআউন এবং তার বাহিনীর! দুনিয়ায় তারা তো রেখে যেতে পারেনি কোনো প্রিয়জন-প্রিয় মানুষ, সুহৃদ-শুভাকাঙ্ক্ষী, তথাপি আসমান এবং জমিনেও রেখে যেতে পারলো না কোনো স্মৃতিচিহ্ন। তৈরি করে যেতে পারলো না তাদের বিদায়ে ব্যথিত হওয়ার কোনো উপলক্ষ।

আমাদের মৃত্যুতে, আমাদের শূন্যতায় ব্যথিত হবে জমিন আর আসমানের মতো জড়বস্তুও—সুবহানাল্লাহ! খুশি হওয়ার জন্য, আনন্দে আত্মহারা হওয়ার জন্য কতো আয়োজনই না করে রেখেছেন আমাদের রব! সত্যই কতো মহান তিনি!

মৃত্যুর মাধ্যমে যখন আমরা হারিয়ে যাবো দুনিয়া থেকে, যখন পাড়ি জমাবো অনন্ত আখিরাতের পানে, তখন আমাদের জন্য হাহাকার করবে জমিনের সেই অংশ, যে অংশে আমি কপাল ঠুকিয়ে আমার মালিককে সিজদাহ করতাম, অশ্রু ঝরাবে আসমানের সেই দরোজা, যা দিয়ে আমার আমলগুলো উত্থিত হতো আর নেমে আসতো আমার রিয্ক—এটুকু জানার পরে আমার কী করা উচিত? আমার কি উচিত নয় আজ থেকে জমিনে সিজদাহর পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া? আমলকে আরও বেশি বাড়িয়ে নেওয়া, যাতে করে আমার জন্য আসমানের সেই দরোজার ব্যথার মাত্রাটা আরও অনেক অনেক বৃদ্ধি পায়? যাতে আমার শূন্যতাটুকু তারা আরও অনেক বেশি করে অনুভব করে?

জীবনের বেলা শেষে যখন আমাদের পদচিহ্ন আর পড়বে না এই দুনিয়ার ধুলো-মাটিতে, সেই সময়ের জন্য আমরা কি কোনো উপলক্ষ তৈরি করে যাচ্ছি, যাতে আমাদের মৃত্যুর পরে জমিন আর আসমানের কোথাও আমাদের জন্য হাহাকার তৈরি হয়, নাকি আমাদের অবস্থা ফিরআউন আর তার বাহিনীর মতো যাদের মৃত্যুতে জমিন আর আসমানের কোথাও কোনো সাড়াশব্দ পড়েনি, যাদের জন্য কাঁদেনি আল্লাহর কোনো জমিন আর অশ্রুপাত করেনি কোনো আসমানি দরোজা?

উঁহু, একজন কথা রাখেন

১

সফল ব্যক্তিদের কথা দুনিয়ার সকলেই আগ্রহভরে শুনতে চায়। বিল গেটস থেকে শুরু করে স্টিভ জবস—ক্যারিয়ারে সফল হওয়ার কারণে তারা তাবৎ দুনিয়ার বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমন্ত্রিত হতো হরহামেশাই।

ব্যর্থ হতে হতে যারা একদিন সফলতা পায়, যদি আমি সেই বিজ্ঞানীর গল্পটার কথা বলি—পড়াশুনায় মনোযোগ নেই বলে যাকে স্কুল থেকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলো শিক্ষক, মায়ের নিবিড় তত্ত্বাবধানে একদিন সেই বালক তার আবিষ্কার দিয়ে তাক লাগিয়ে দেয় গোটা দুনিয়াকে!

ছোটোবেলায় পাঠ্যপুস্তকে পড়া রাজা রবার্ট ব্রুসের গল্পটার কথাও যদি বলি—শত্রুর কাছে হারতে হারতে যে বিলীন হতে বসেছিলো, একদিন গুহার মধ্যে একটা ছোট্ট মাকড়সা যার অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে এবং যে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করতে সমর্থ হয় তার হারানো সাম্রাজ্য—এসবগুলোই ব্যর্থতার পথ পাড়ি দিয়ে সফলতার সোপানে পৌঁছানোদের গল্প।

কিন্তু যে ছেলেটার সত্যিই পড়ালেখায় কোনোদিন মনোযোগ ছিলো না, যাকেও একদিন স্কুল শিক্ষক তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিরস্কার করে এবং যে শেষপর্যন্ত একজন বিজ্ঞানী হতে পারেনি,

অথবা,

যে রাজা বারংবার হারতে হারতে একদিন সত্যিই বিলীন হয়ে গিয়েছে ইতিহাসের পাতা থেকে, যার জীবনে অনুপ্রেরণা হয়ে ধরা দেয়নি কোনো মাকড়সা, যার

কোনোদিন হয়ে ওঠা হয়নি ইতিহাস-গড়া বীর রবার্ট ব্রুস,

কিংবা

যে ছেলেটা পেরুতে পারে না বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি, গ্র্যাজুয়েশান শেষ করেও যে ছেলেটা বেকারত্বের অভিশাপ মাথায় নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরছে, অহংকার করে বলার মতো যে ছেলেটার সিজিপিএ নেই—তাদের কাউকেই ইতিহাস মনে রাখে না। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কোনোদিন তাদের ডাকা হবে না। এলিটদের সভা-সেমিনারে, গুরুত্বপূর্ণ আর বর্ণাঢ্য আয়োজনে তারা হবে না কোনোদিন আমন্ত্রিত। অনুজদের অনুপ্রেরণা দিতে এদের ব্যর্থতার গল্পগুলো কোনোদিন ঠাঁই পাবে না পাঠ্যপুস্তকের পাতায়।

কারণ—ইতিহাস শেষ পর্যন্ত বিজয়ীরাই লেখে আর সকলে কেবল বিজয়ীদের কথা শুনতেই পছন্দ করে।

২

উঁহু, একটু ভুল বলেছি।

দুনিয়ার সকলেই কেবল বিজয়ীদের গল্প শুনতে চাইলেও, আসমানে একজন আছেন যিনি সর্বদা অপেক্ষা করে থাকেন তাঁর অ-সফল, হারতে হারতে মিলিয়ে যাওয়ার একেবারে দ্বারপ্রান্তে এসে যাওয়া বান্দারা, যে বান্দাটার ঝুলিতে দুনিয়ার কোনো অর্জন নেই, নেই তাক লাগানোর মতো সিজিপিএ কিংবা ক্যারিয়ার, নেই মোটা অঙ্কের স্যালারি কিংবা স্ট্যাটাস—তিনি অপেক্ষা করেন তাদের গল্পগুলোও শুনবার জন্য।

গুনাহ করতে করতে ক্ষয়ে যাচ্ছে যাদের হৃদয়, পাপের ভারে নুইয়ে পড়েছে যাদের অন্তর, প্রবৃত্তির তাড়নায় পথভ্রান্ত হয়ে যারা তলিয়ে যাচ্ছে জাহিলিয়াতের অতল তলে—তাদের গল্পগুলো তাদের মুখ থেকে শোনার জন্য, সেই অন্ধকার থেকে তাদেরকে টেনে তুলতে, ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিতে তাদের কলুষিত অন্তর—কতো অধীর অপেক্ষাই না তিনি করেন!

সূরা আয-যুমারে তিনি বলেছেন,

> قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾
>
> "বলুন, 'আমার বান্দারা! যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছো (পাপের দ্বারা), আল্লাহর রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ে যেয়ো না। আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৬৪]

আল্লাহর ডাকটা খেয়াল করেছেন একবার? তিনি কিন্তু বলেননি, 'আমার মুমিন বান্দারা', অথবা 'আমার মুত্তাকী বান্দারা।' বরং তিনি বলেছেন, 'আমার বান্দারা।'

এই 'আমার বান্দা' ডাকটার মাঝে দুনিয়ার সমস্ত আস্তিক-নাস্তিক-কাফির-মুশরিক, পাপী-তাপী-ঈমানদার-মুত্তাকী—আমরা সকলে অন্তর্ভুক্ত।

শির্ক করে ফেলেছেন? নিরাশ হবেন না। আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন—তিনি ক্ষমা করে দেবেন।

এমন কোনো গুনাহ করে ফেলেছেন, যা ভাবছেন ক্ষমার অযোগ্য?

একবার আল্লাহর কাছে দিল খুলে তাওবা করুন। নিজের ভুলটাকে স্বীকার করে তাঁর দরবারে কেবল দুই ফোঁটা অশ্রু ফেলুন—তিনি আপনার সমস্ত অপরাধ, যদি তা আসমানও ছোঁয়, ক্ষমা করে দেবেন। বান্দার ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান শুনবার জন্য তিনি অপেক্ষা করেন। শেষ রাত্তিরে দুনিয়ার নিকটতম আসমানে এসে তিনি ডাকতে থাকেন, 'কেউ কি আছো, যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।'

তিনি গাফূরুর রাহীম। অতিশয় দয়ালু। তাঁর দয়া বিজয়ী হয় তাঁর ক্রোধের ওপরে। নিজের দয়া আর ভালোবাসাকে তিনি সত্তর ভাগে ভাগ করেছেন। এক ভাগ বিলিয়ে দিয়েছেন সমস্ত সৃষ্টির মাঝে। বাকি ঊনসত্তর ভাগ তিনি রেখে দিয়েছেন নিজের কাছে—নিজের গুনাহগার বান্দাদের জন্য। আমাদের বাবা-মা'রা আমাদেরকে যেটুকু ভালোবাসেন, কিংবা আমরা আমাদের সন্তানদের

---

৬৪. সূরা যুমার, ৩৯ : ৫৩।

যেটুকু ভালোবাসি—তা ওই এক ভাগের মধ্যেই। সেই এক ভাগ ভালোবাসা যদি এতোখানি প্রগাঢ় হয়, সেই এক ভাগ ভালোবাসা পেয়েই যদি আমাদের বাবা-মায়েরা আমাদের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারেন, তাহলে যার কাছে উনসত্তর ভাগ ভালোবাসার ঝুলি, কেমন দয়ালু হতে পারেন সেই রব?

বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত, ব্যর্থ আর নিরাশাবাদীদের গল্প দুনিয়ার কেউ শুনতে না চাইলেও, দুনিয়ার কেউ তাদের কথা না রাখলেও আমরা এমন একজন রবের ইবাদাত করি, যিনি সকলের কথা সমান আগ্রহভরে শোনেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার 'কেউ কথা রাখেনি' কবিতায় লিখেছেন—'কেউ কথা রাখেনি। তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখেনি।' মামা বাড়ির মাঝি নাদের আলী এবং বরুণা তাদের কথা রাখেনি বলে সুনীলের ছিলো একবুক আক্ষেপ। কিন্তু আমরা জানি—দুনিয়ার কেউ তাদের কথা রাখুক কিংবা না-রাখুক, আমাদের একজন রব আছেন, যিনি অবশ্যই তাঁর কথা রাখেন। একবিন্দু হেরফের করেন না তাঁর ওয়াদায়।

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ওয়াদার ব্যত্যয় করেন না।"[৬৫]

এমন দয়াময় যে রব, তাঁকে ভালো না বেসে পারা যায়, বলুন?

---

৬৫. সূরা রা'দ, ১৩ : ৩১।

চালাও সে পথে যে পথে তোমার প্রিয়জন গেছে চলি

ফিরআউনের ডুবে মরার কিছুকাল পরে, আল্লাহর কাছ থেকে মূসা আলাইহিস সালাম আদেশপ্রাপ্ত হলেন তূর পাহাড়ে গিয়ে ইবাদাত-বন্দেগি করার। প্রথমে ত্রিশ দিনের জন্য বের হলেও, সে মেয়াদকাল বাড়িয়ে পরে চল্লিশ দিন করা হয়। অর্থাৎ—তূর পাহাড়ে মূসা আলাইহিস সালাম একাকী চল্লিশ দিন অবস্থান করবেন।

এই নির্দিষ্টকালের জন্য মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর ভাই হারূন আলাইহিস সালামকে বনী ইসরাঈলিদের মাঝে রেখে গেলেন। হারূন আলাইহিস সালাম নিজেও ছিলেন একজন নবি। তাঁকে মূসা আলাইহিস সালাম সমস্তকিছু বুঝিয়ে দিয়ে তূর পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা করলেন।

বনি ইসরাঈল সমাজে তখন একজন লোক ছিলো সামিরি নামে। মূসা আলাইহিস সালামের লোকালয় ছেড়ে যাওয়ার অব্যবহিত পরে, সে বনি ইসরাঈল সম্প্রদায়কে বললো, 'ফিরআউন সম্প্রদায়ের লোকেদের অনেক স্বর্ণ আর মণি-মুক্তো তো তোমাদের কাছে জমা আছে। ওরা তো জলে ডুবেই মরলো, এক কাজ করো—স্বর্ণ অলংকারগুলো তোমরা আমার কাছে এনে জমা দাও।'

বনি ইসরাঈলিদের কাছে সামিরি নামের এই ব্যক্তির কিছুটা গ্রহণযোগ্যতা ছিলো। তার কথায় প্রলুব্ধ হয়ে তারা সবাই নিজেদের কাছে থাকা সকল স্বর্ণালংকার এনে জমা দিয়ে গেলো তার কাছে। কিন্তু ততোক্ষণে সামিরি যে ইবলীসের ফাঁদে পড়ে বিভ্রান্তির পথে হাঁটা শুরু করেছে—সেটা বুঝে উঠতে

পারেনি বনি ইসরাঈলিদের কেউ-ই।

সামিরি সেই স্বর্ণালংকারগুলো আগুনে পুড়িয়ে গলিয়ে ফেললো। গলানো সেই বস্তু দ্বারা সে গাভীর বাছুরের অবয়বের মতো একটা প্রতিকৃতি তৈরি করে, সেটা দিয়ে কীভাবে বনি ইসরাঈলিদের বিভ্রান্ত করা যায়—তা নিয়ে ভাবতে লাগলো। তখন তার মনে পড়লো একটা কথা। যেদিন ফিরআউন তার বাহিনী নিয়ে ডুবে যাচ্ছিলো, সেদিন ঘটনার অকুস্থলে ঘোড়ায় আরোহিত এক ব্যক্তিকে সে দেখেছিলো। কেউ একজন তাকে বলেছিলো, 'এই ব্যক্তির ঘোড়ার খুরের তলার মাটি সংগ্রহে রাখো। এই মাটি যেখানে ছিটাবে, সেখানেই প্রাণের স্পন্দন দেখতে পাবে।'

বস্তুত, সেদিন ঘোড়ায় আরোহিত ওই ব্যক্তি ছিলেন জিবরাইল আলাইহিস সালাম এবং যে তাকে জিবরাইল আলাইহিস সালামের ঘোড়ার খুরের তলার মাটি সংগ্রহে রাখতে বলেছিলো, সে ছিলো চির অভিশপ্ত শয়তান ইবলীস।[৬৬]

সামিরির মনে পড়ে গেলো ইবলীসের বাতলে দেওয়া কথাগুলো। সেদিন জিবরাইল আলাইহিস সালামের ঘোড়ার খুরের তলার মাটি পরম যত্নে সংগ্রহ করে রেখেছিলো সে। এরপর যখন স্বর্ণালংকার গলিয়ে তা দিয়ে বাছুর আকৃতির একটা অবয়ব-কাঠামো দাঁড় করানো শেষ হলো, ওই মাটিটুকু সেটার গায়ে ছিটিয়ে দিলো সামিরি। এরপর অবাক বিস্ময়ে সে দেখলো—বাছুরের মুখ দিয়ে গরুর আওয়াজের মতো 'হাম্বা হাম্বা' শব্দ বের হচ্ছে।

নিজের ক্ষমতা দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলো সামিরি। সে ভাবলো—বনি ইসরাঈলিদের বিভ্রান্ত করার জন্য যুতসই একটা জিনিস হয়েছে এটা!

ওই বাছুরের প্রতিকৃতিসহ সামিরি বনি ইসরাঈলিদের সামনে উপস্থিত হলো এবং বললো,

هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾

"এটাই হলো তোমাদের ইলাহ এবং এটা মূসারও ইলাহ। কিন্তু মূসার ভুল হয়ে গেছে।"[৬৭]

---

৬৬. ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৫/৩১৩; ইবনু আবী হাতিম, তাফসীর, ৭/২৪৩১।

৬৭. সূরা ত্ব-হা, ২০ : ৮৮।

অর্থাৎ সামিরি ওই বাছুরকে দেখিয়ে বনি ইসরাঈলিদের বললো—আমার নিয়ে আসা বাছুরটাই তোমাদের প্রকৃত ইলাহ। মূসা তো এই ইলাহের কথাই তোমাদের বলে থাকে। মূসা ভুলে এটাকে খুঁজতে তূর পাহাড়ে চলে গেছে।

সামিরির এই কথায় সকল বনি ইসরাঈলি বিশ্বাস করে ফেললো। এরূপ অবিশ্বাস্য কোনোকিছু ইতঃপূর্বে যেহেতু তারা দেখেনি, ফলে সামিরির কথাকে অবিশ্বাস করাও দুঃসাধ্য তাদের জন্য। তারা ধরে নিলো—মূসা আলাইহিস সালাম যে ইলাহের কথা তাদের বলেন, এই বাছুরই সেই ইলাহ। তারা সদলবলে সামিরির দলে যোগ দিয়ে দিলো এবং সেই বাছুরকে নিজেদের উপাস্য ভেবে উপাসনা করতে আরম্ভ করলো।

মূসা আলাইহিস সালামের ভাই হারূন আলাইহিস সালাম ছিলেন অতিশয় নরম প্রকৃতির মানুষ। মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর অবর্তমানে ভাই হারূনকেই বনি ইসরাঈলিদের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন। তারা যখন সম্মিলিতভাবে সামিরির কথায় বিভ্রান্ত হয়ে বাছুর পূজোয় লিপ্ত হয়ে গেলো, তখন হারূন আলাইহিস সালাম তাদেরকে সাবধান করে বলেন,

> يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿٩٠﴾
>
> "হে আমার সম্প্রদায়! এর দ্বারা তো তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আর তোমাদের রব তো অতিশয় দয়াময়। কাজেই তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার আদেশ মেনে চলো।"[৬৮]

কিন্তু প্রবৃত্তির মোহে অন্ধ বনি ইসরাঈলিরা হারূন আলাইহিস সালামের কথায় কর্ণপাত তো করলোই না, বরং উল্টো তাঁকে হত্যা-চেষ্টার দুঃসাহসও দেখিয়েছে। বিভ্রান্ত এবং বিকারগ্রস্ত বনি ইসরাঈল কওম এক ইলাহের উপাসনা বাদ দিয়ে লেগে গেলো বাছুরের উপাসনায়।

চল্লিশ দিন তূর পাহাড়ে অবস্থান করে, আল্লাহর কাছ থেকে ওহি তথা তাওরাত প্রাপ্ত হয়ে মূসা আলাইহিস সালাম ফিরে এলেন জনপদে। তাওরাতের আয়াতগুলো লেখা ছিলো কতিপয় ফলকের মাঝে। জনপদে এসে দেখলেন তাঁর কওম ইতোমধ্যেই আল্লাহকে বাদ দিয়ে একটা কৃত্রিম বাছুরের উপাসনা শুরু

---

৬৮. সূরা ত্ব-হা, ২০ : ৯০।

করেছে। এতো অল্প সময়ের ব্যবধানে বনি ইসরাঈলিদের এমন মাত্রার পদস্খলন মূসা আলাইহিস সালামকে ভীষণভাবে আহত করলো। অসম্ভব রেগে গেলেন তিনি। সেই অবস্থার একটা বর্ণনা কুরআনে এসেছে,

> وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
>
> "তারপর মূসা যখন ক্ষোভ আর ক্রোধ নিয়ে তাঁর লোকজনের কাছে ফিরে এলো, তখন বললো—'আমার অনুপস্থিতিতে কতো নিকৃষ্টভাবেই না তোমরা আমার প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেছো! তোমাদের প্রতিপালকের নির্দেশ লাভের পূর্বেই তোমরা তাড়াহুড়ো করে বসলে?'
>
> অতঃপর সে ফলকগুলো ছুড়ে ফেলে দিলো এবং স্বীয় ভাই হারূনের মাথার চুল ধরে টেনে নিজের কাছে টেনে নিয়ে এলো। হারূন বললো, 'আমার মায়ের পেটের ভাই! এ জাতি আমাকে দুর্বল মনে করেছে এবং আমাকে হত্যা করতেও উদ্যত হয়েছে। কাজেই তুমি আমার সাথে এমনকিছু করো না, যা শত্রুদের আনন্দিত হওয়ার খোরাক দেয়। আর আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়ো না।'"[৬৯]

২

আমি ভাবতাম—আচ্ছা, সূরা ফাতিহা প্রতি ওয়াক্তে, প্রতি রাক'আতে তিলাওয়াত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে কেন? কেন প্রতি ওয়াক্তে আমাদেরকে বলতে হয়—'হে আল্লাহ, আমাদেরকে সরল-সঠিক পথে আপনি পরিচালিত করুন'?

এর একটা সম্ভাব্য উত্তর আমি পেয়েছিলাম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে। তিনি বলেছিলেন, 'কিয়ামতের প্রাক্কালে এমন হবে যে—

---

৬৯. সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৫০।

মানুষ সকালবেলা মুমিন থাকলেও সন্ধ্যেবেলা কাফির হয়ে যাবে। সন্ধ্যেবেলা কাফির থাকলেও, সকাল হতে হতে মুমিন হয়ে যাবে।'[৭০] অর্থাৎ সময়টা এতোটা অস্থির আর সংকটাপন্ন থাকবে যে—কার ঈমান কখন আসছে আর কখন যাচ্ছে তা বুঝে ওঠাই মুশকিল হয়ে যাবে।

এজন্য প্রতি সালাতে, প্রতি ওয়াক্তে এবং প্রতি রাক'আতে আমাদেরকে ঈমানের পথে অটল-অবিচল থাকার প্রার্থনা করতে হয়। আসরের সালাত পড়ে বাসায় এসে মাগরিবের আগে যে ঈমানহারা হয়ে যাবে না—তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই আসরের সালাতে 'ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাকীম' তথা 'আমাদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করুন' এই আয়াত তিলাওয়াত করে আসার পর মাগরিবের সালাতে গিয়েও একই আয়াত আবার, বারবার আমাদের পড়তে হয়। আসর থেকে মাগরিব—এই অল্প সময়ের মাঝেও যে আমরা সংশয়ে পড়ে যাবো না, আমাদের ঈমান হুমকির মুখে পড়ে যাবে না তার নিশ্চয়তা আমরা কেউ দিতে পারি না। তাই আসরের সালাতে আল্লাহর কাছে হিদায়াত চেয়ে এসে মাগরিবের সালাতে গিয়ে আবার হিদায়াত চাইতে হয়। মাগরিবের সালাতে হিদায়াত চেয়ে এসে ইশা'তে গিয়ে আবার চাওয়া লাগে। এই হিদায়াত চাওয়াটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য দৈনিক রুটিন বানিয়ে দিয়েছেন।

মূসা আলাইহিস সালামের কওম বনি ইসরাঈলিদের ঘটনাটা পড়ে আমার মনে হলো—এই যে প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আমরা বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহর কাছে হিদায়াত প্রার্থনা করি, এটা অতি-অবশ্যই জরুরি ছিলো।

ফিরআউনের অত্যাচারের বর্ণনা কুরআন থেকে আমরা যথেষ্ট পাই। বনি ইসরাঈলিদের জীবনকে ছারখার করে দিচ্ছিলো অত্যাচারী, জালিম ফিরআউন। হেন কোনো অত্যাচার-নির্যাতন আর নিষ্পেষণ নেই, যা ভোগ করতে হচ্ছিলো না বনি ইসরাঈল সম্প্রদায়কে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবি মূসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে এই জালিম শাসকের হাত থেকে বনি ইসরাঈলিদের মুক্তি দিলেন। শুধু তা-ই নয়, বনি ইসরাঈলিদের চোখের সামনে ফিরআউন এবং তার বাহিনীকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ডুবিয়ে মারলেন লোহিত সাগরের অতল তলে। বনি ইসরাঈলিদের প্রতি এই অপার দয়া আর অনুগ্রহ এবং মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এই শক্তির পরিচয়

---

৭০. দেখুন—মুসলিম, ১১৮; তিরমিযি, ২১৯৫; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১০৭৭২।

বনি ইসরাঈলি সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটা লোক খুব কাছ থেকে, নিজের চোখে অবলোকন করেছে।

একবার দৃশ্যটা ভাবুন তো—আপনার চোখের সামনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার জন্য সমুদ্রের মাঝে পথ তৈরি করে দিলেন। সেই পথ ধরে হেঁটে আপনি পার হয়ে গেলেন সু-বিশাল সমুদ্র! আপনার চারপাশে থৈ থৈ করছে সমুদ্রের জল। কোনো এক অদৃশ্য শক্তি-বলে জলের এই স্রোত যেন আটকে আছে। আছড়ে পড়লেই অতল তলে তলিয়ে যাবেন আপনি। কিন্তু না! আপনাকে পথ করে দিতে সমুদ্র যে পালন করছে এক মহান দায়িত্ব!

পেছনেই আপনার শত্রুবাহিনী যারা এতোদিন ধরে অতিষ্ঠ করে তুলেছে আপনার জীবন। হত্যা করেছে আপনার অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বন্ধু-পরিজন। আপনার জীবনকে ছারখার করে দিতে এমন কোনো আয়োজন নেই, যা তারা করেনি। আপনি দেখতে পাচ্ছেন—সমুদ্রের বুকে তৈরি হওয়া যে পথ ধরে আপনি পার হয়ে এসেছেন, সেই একই পথ ধরেছে আপনার শত্রুবাহিনীও। ভীষণ দাপটের সাথে তারা ছুটে আসছে আপনাকে বন্দী করতে। একবার ধরতে পারলেই সবকিছু শেষ! কিন্তু সবকিছু শেষ আপনার হয়নি, হয়েছে তাদের। সমুদ্রের যে জল দুভাগ হয়ে আপনার জন্য পথ তৈরি করেছিলো, সেই একই জল মাঝ দরিয়ায় আপনার শত্রুবাহিনীর ওপরে প্রবল শক্তিতে আছড়ে পড়লো।

এমন ঘটনা যদি আপনার জীবনে ঘটতো, কেমন হতো আপনার ঈমানের অবস্থা? চিন্তাও করা যায় না!

আল্লাহর এমন চাক্ষুষ সাহায্য, এমন অপার রহমত লাভ করতে পারলে যেখানে সারাটা জীবন সিজদায় লুটিয়ে পড়ে কাটিয়ে দেওয়ার কথা, সেখানে বনি ইসরাঈল সম্প্রদায় কী করেছে?

ফিরআউনের হাত থেকে মুক্তিলাভের কিছুদিন পরে আল্লাহর আদেশে মূসা আলাইহিস সালাম গেলেন তূর পাহাড়ে। তিনি সেখানে চল্লিশ দিন থাকবেন। বনি ইসরাঈল সম্প্রদায়ের কাছে রেখে গেলেন নিজের ভাই হারূন আলাইহিস সালামকে। মূসা আলাইহিস সালামের এই চল্লিশ দিনের অনুপস্থিতিতেই, বনি ইসরাঈল সম্প্রদায় একটা কৃত্রিম বাছুরের মূর্তিকে নিজেদের 'ইলাহ' মেনে নিয়ে উপাসনা শুরু করে দিয়েছে। ভাবতে পারেন কতোখানি অকৃতজ্ঞ, অজ্ঞ এবং

নড়বড়ে ঈমানের ছিলো তারা?

এরা স্ব-চক্ষে মূসা আলাইহিস সালামের মু'জিযাগুলো দেখেছে আগে। মূসা আলাইহিস সালামের হাতের লাঠি ছেড়ে দিলে যেটা বিশালকায় সাপ হয়ে যেতো—সেই ঘটনা এরা জানতো। বাকশোতে ভরে কীভাবে মূসা আলাইহিস সালামকে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, কীভাবে ফিরআউন-পত্নীর মাধ্যমে মূসা আলাইহিস সালাম ফিরআউনের গৃহে আশ্রয় পান, কীভাবে শত্রুর ঘরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মূসা আলাইহিস সালামকে বড় করে তুলেছেন—এর সবই এদের জানা।

তা তো বটেই! মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর লাঠি দিয়ে যখন সমুদ্রের পানিতে আঘাত করলো, সাথে সাথে সমুদ্র ফুঁড়ে যে রাস্তা তাদের জন্য তৈরি হয়েছে, সেটা কি তারা দেখেনি? তারা কি দেখেনি ফিরআউন তার বাহিনী সমেত কীভাবে ডুবে মরেছে সমুদ্রের অথৈ জলে? এসবকিছুই তারা দেখেছে।

এসবকিছু দেখার পরেও, কেবল অল্পকিছু সময়ের ব্যবধানে তারা মূসা আলাইহিস সালামের রবকে ত্যাগ করে পূজো করা শুরু করে দিলো একটা কৃত্রিম বাছুরের প্রতিকৃতিকে! এই পদস্খলনকে আপনি কোন অভিধায় ভূষিত করবেন, বলুন?

এতো আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনা নিজেদের চোখে দেখে, নিজেদের কানে শুনেও ঈমানহারা হতে তাদের সময় লেগেছে কয়েকটা দিন মাত্র! এতোকিছু এতো নিবিড়ভাবে দেখবার পরেও বনি ইসরাঈলি সম্প্রদায়ের যদি এই অবস্থা হয়, সেখানে আমাদের অবস্থা তো আরও করুণ হওয়ার কথা।

তাই বনি ইসরাঈলি সম্প্রদায়ের মতো ঈমানহারা হয়ে চরম দুর্ভোগ আর দুর্দশায় যাতে আমাদের নিপতিত না হতে হয়, সেজন্যই প্রতি ওয়াক্ত সালাতে, প্রতি রাক'আতে তিনি আমাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকীম তথা ঈমানের পথে, তাঁর রাস্তায় থাকার ফরিয়াদ করতে শিখিয়ে দিয়েছেন। আমরা সূরা ফাতিহার মধ্যে প্রতিবার বলি—

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٦

"আমাদেরকে দেখান সরল-সঠিক পথ।"[৭১]

৭১. সূরা ফাতিহা, ১ : ৬।

৩

ওপরের ঘটনা থেকে আরেকটা ব্যাপার ভীষণভাবে লক্ষণীয়। সূরা আল-আ'রাফের ওই আয়াতে হারূন আলাইহিস সালামের একটা কথা কি খেয়াল করেছেন? তূর পাহাড় থেকে চল্লিশ দিনের সফর শেষ করে যখন মূসা আলাইহিস সালাম ফিরে এলেন, বনি ইসরাঈল সম্প্রদায়ের এহেন নিকৃষ্টতম পদস্খলন দেখে রাগ আর ক্ষোভে ফেটে পড়েন তিনি। নিজের ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পেরে একপর্যায়ে তিনি হারূন আলাইহিস সালামের চুল ধরে তাঁর দিকে টেনে নিয়ে আসেন। বনি ইসরাঈলিদের পদস্খলনের কারণে ভাই হারূন আলাইহিস সালামের ওপরে মূসা আলাইহিস সালামের খানিকটা ক্ষোভ জন্মে এই কারণে যে—তিনি তো এই সম্প্রদায়কে একলা ছেড়ে যাননি। দায়িত্ব দিয়ে রেখে গিয়েছিলেন হারূন আলাইহিস সালামকে। হারূন আলাইহিস সালাম কেন পারলেন না তাদের এই অধঃপতন ঠেকাতে?

হারূন আলাইহিস সালাম যে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেননি তা আমরা পূর্বেই জেনেছি। কিন্তু রাগের বশে মূসা আলাইহিস সালাম যখন হারূন আলাইহিস সালামের ওপরে চড়াও হলেন, তখন হারূন আলাইহিস সালাম বললেন, 'তুমি আমার সাথে এমনকিছু করো না, যা শত্রুদের আনন্দিত হওয়ার খোরাক দেয়।'

মূসা আলাইহিস সালাম হারূন আলাইহিস সালামের সাথে এই আচরণ করেছিলেন বনি ইসরাঈল সম্প্রদায়ের সামনে। সেজন্যই হারূন আলাইহিস সালাম বলছিলেন তাঁর সাথে এমনকিছু না করতে যা বনি ইসরাঈলিদের আনন্দিত হওয়ার কিংবা মজা লাভের খোরাক দেয়। মূসা আলাইহিস সালাম যদি হারূন আলাইহিস সালামকে মারতে উদ্যত হন, কিংবা কর্কশ ভাষায় তিরস্কার করেন, অথবা গলা উঁচিয়ে তাঁকে চলে যেতে বলেন লোকালয় ছেড়ে—এর সবটাই বনি ইসরাঈলিদের আনন্দের খোরাকি হবে। এই 'আনন্দের খোরাকি পাওয়া বা হাসতে দেওয়া' বলতে যে আরবি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা এসেছে 'শামাতাহ' শব্দ থেকে যার অর্থ—কাউকে দুর্ভোগে পড়তে দেখলে আনন্দ পাওয়া। এই অভ্যাস অবশ্যই অন্তরের একটা ব্যাধি এবং এই আয়াতেও তা সে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কেউ দুর্ভোগে পড়েছে দেখে আনন্দ পাওয়া!

আচ্ছা, আমরা নিজেরাও কি এই ব্যাধি থেকে মুক্ত? অন্যকে দুর্ভোগে পড়তে দেখলে মনে মনে আমরাও কি আনন্দ পাই না? কারও চাকরি চলে গেছে শুনলে এমন ভান করি যেন আমরা খুব দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু মনে মনে আমাদের সে কী আনন্দ! কেউ পরীক্ষায় ফেল করেছে শুনলে ভালোই লাগে। কারও ব্যবসা ভালো যাচ্ছে না শুনতে পেলে আনন্দে নেচে ওঠে মন। কারও সংসারে শান্তি নেই শুনলে তো দিব্যি শান্তি পাই। মোদ্দাকথা কাউকে কোনো দুর্ভোগে পড়তে দেখতেই কেমন যেন মজা লাগে আমাদের। আমরা অনেক সময় 'কেমন আছেন' প্রশ্নটা অপর প্রান্ত থেকে 'খুব একটা ভালো নেই' উত্তর শোনার বাসনা থেকেই করে থাকি।

আমি দাবি করছি না যে আমরা প্রত্যেকেই এরকম। তবে আমাদের অধিকাংশেরই অন্তরে এই 'শামাতাহ' তথা 'অন্যের দুর্ভোগ দেখে আনন্দ পাওয়া' রোগ বিদ্যমান। এই রোগ বনি ইসরাঈলিদের মাঝে ছিলো। হারূন আলাইহিস সালামকে দুর্ভোগে পড়তে দেখলে তারা যে তাতে আনন্দ পাবে—এটা তিনি জানতেন। তাই মূসা আলাইহিস সালামকে তিনি এমনকিছু না করতে অনুরোধ করেছেন, যা প্রতিপক্ষের জন্য আনন্দের খোরাকি হয়।

অন্যের ভালো দেখে গা জ্বললে তাকে বলে হাসাদ। আর অন্যের দুর্ভোগ দেখে আনন্দ পেলে তাকে বলে শামাতাহ। দুটোই অন্তরের কঠিন ব্যাধি। এই ব্যাধিগুলো থেকে যদি আমরা আমাদের অন্তরকে মুক্ত না করতে পারি, যদি এসব জিইয়ে রেখে দিই হৃদয়ে—আমাদের সত্যিকারের আত্মশুদ্ধি তাহলে কোনোকালেই সম্ভব নয়। সত্যিকারের আত্মশুদ্ধির জন্য দরকার একটা 'কলবুন সালীম' তথা পরিশুদ্ধ অন্তর। সেই অন্তরে কারও ব্যাপারে হাসাদ থাকবে না, থাকবে না কারও জন্য শামাতাহ।

৪

আরেকটা ব্যাপার এখানে আমাদের শেখার আছে বৈকি! বর্তমান অনলাইনের দুনিয়ায় পান থেকে চুন খসলেই আমরা যখন-তখন আমাদের দ্বীনি ভাই-বোন,

আমাদের আলেম-উলামা, আমাদের দাঈ-লেখক-অ্যাক্টিভিস্ট, আমাদের মুরব্বিদের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠি। কারও কোনো সামান্যতম ত্রুটি পেলেই আমরা যেন ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো সদলবলে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিতে চাই। এতে আমাদের নফস তথা প্রবৃত্তি তৃপ্ত হয় যদিও, কিন্তু বৃহত্তর কোনো কল্যাণ আদৌ হয় কি?

হারূন আলাইহিস সালামের কথাগুলো আরেকবার পড়ুন তো—'তুমি আমার সাথে এমনকিছু করো না, যা শত্রুদের আনন্দিত হওয়ার খোরাক দেয়।'

হতে পারে আমাদের কোনো ভাই কোনো একটা ভুল করেছেন, অথবা আমাদের কোনো আলিম হয়তো কোনো একটা বিষয়ে ভুল সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, কিংবা আমাদের কোনো একজন দাঈ বা অ্যাক্টিভিস্টের দ্বারা এমন কোনো একটা কাজ হয়ে গেছে, যা আদতে সঠিক নয়। যদি সেটা উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থের জন্য হুমকির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়, তাহলে আমাদের প্রধানতম দায়িত্ব হবে তাদের সেই ভুলগুলোকে জনপরিসরে প্রচার না করে, একান্ত ব্যক্তিগতভাবে তাকে নাসীহাহ তথা পরামর্শ দেওয়া। তার ভুলটা তাকে ধরিয়ে দেওয়া। এটাই সংশোধনের সত্যিকার পদ্ধতি। কিন্তু ভার্চুয়ালের অস্থির দুনিয়ায় আমরা সকলেই সকলকে লাঞ্ছিত আর নিগৃহীত হতে দেখতেই কেমন যেন পছন্দ করি। ওই যে—শামাতাহ। অন্যের দুর্ভোগ দেখে আনন্দ পাওয়া। তাই আমরা ব্যক্তির ভুল, সে বড় কিংবা ছোটো যা-ই হোক, ফলাও করে প্রচার করতেই বেশি আগ্রহ পাই। কিন্তু এতে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হই আমরা নিজেরা। আমরা যখন ছোটোখাটো বিষয়াবলি নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব আর কোন্দলে লিপ্ত হবো, তখন আমাদের প্রতিপক্ষ শিবির, অর্থাৎ ইসলাম বিদ্বেষীরা এর সুযোগ গ্রহণ করবে। তারা আমাদের উস্কে দিয়ে আমাদের মাঝে বিভেদকে আরও প্রকট করে তুলতে চাইবে, যাতে আমরা দুর্বল হয়ে পড়ি। যাতে আমাদের সংঘবদ্ধ শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যায়।

হারূন আলাইহিস সালাম মূসা আলাইহিস সালামকে তাঁর সাথে এমনকিছু করতে বারণ করেছেন, যা শত্রুপক্ষের জন্য আনন্দের ব্যাপার হবে। এতে শত্রুপক্ষ একটা সুযোগ নিয়ে দুই ভাইয়ের মাঝে বিরোধ বাঁধিয়ে দেবে। শত্রুপক্ষ যদি তাতে সফল হয়ে যায়, তখন ক্ষতিগ্রস্ত হবে আল্লাহর দ্বীন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই উম্মাহকে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় হতে

বলেছেন। আমরা আমাদের ভেতরকার ভুল বোঝাবুঝি, দ্বন্দ্ব এবং ছোটোখাটো বিচ্যুতিগুলোকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সমাধান করে ফেলবো। সেগুলোকে এমন জায়গায় নিয়ে আসবো না, যাতে করে আমাদের শত্রুপক্ষ আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করার সুযোগ পায় এবং আমাদেরকে দুর্বল ভাবতে শুরু করে।

অধ্যায়টা সূরা ফাতিহার আলোচনা দিয়ে শুরু হয়ে আমাদের ভ্রাতৃত্বের মেলবন্ধনে এসে থেমেছে। সূরা ফাতিহায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে 'সরল-সঠিক পথের' দিশা চাওয়ার পর আমরা আরও একটা জিনিস চাই—আমরা তাঁদের পদচিহ্ন ধরে এগুতে চাই, যারা সেই সরল-সঠিক পথে আমাদের আগে আগে চলে গেছেন। সেই পথে, যে পথে হেঁটে গেছেন রাহমানের সালিহীন বান্দাগণ। সেই চাওয়াটাই হোক দুআর মাঝে আমাদের নিরন্তর আওড়ানো বুলি—চালাও সে পথে যে পথে তোমার প্রিয়জন গেছে চলি।

তোমার প্রতিবেশী করে নিয়ো

কুরআনে বর্ণিত নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে আছিয়া আলাইহাস সালামের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাবৎ দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট জালিম ফিরআউনের স্ত্রী ছিলেন তিনি। মহামহিম এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়নের পর এমন কোনো অত্যাচার-নির্যাতন নেই, যা আছিয়া আলাইহাস সালামকে ভোগ করতে হয়নি। কিন্তু তবুও—ঈমানের পথ থেকে এক চুল পরিমাণ বিচ্যুত হননি এই মহীয়সী। এই রমণী সাহসিকা যুগ থেকে যুগান্তরে মুসলিম নারীদের মনন এবং মানসে সাহস আর অনুপ্রেরণার বাতিঘর হয়ে থাকবেন।

আছিয়া আলাইহাস সালামকে খুব বিস্তৃতভাবে কুরআন তুলে ধরেনি। তবে—তাঁর করা খুব সুন্দর একটা দুআকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে স্থান দিয়েছেন। দুআটাতে এতো বেশি আবেগ আর ভালোবাসা মেশানো যে—যেকোনো মুমিনের হৃদয় তাতে বিগলিত হতে বাধ্য।

সূরা আত-তাহরীমে আমরা সেই দুআটা দেখতে পাই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুই স্ত্রীর সামনে মুমিন, ধৈর্যশীলা এবং সৎকর্মশীলা রমণীর উদাহরণ পেশ করতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আছিয়া আলাইহাস সালামের দুআটার কথা তুলে ধরেন। জালিম ফিরআউনের হাতে যখন নির্মমভাবে নির্যাতিত হচ্ছিলেন তিনি, যখন এসে পৌঁছালেন ধৈর্যের একেবারে শেষ বিন্দুতে, তখন আল্লাহর কাছে করজোড় ফরিয়াদে বললেন :

> رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
>
> "আমার রব, আপনার নিকটে, জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করুন।" (সূরা তাহরীম, ৬৬ : ১১)

খেয়াল করুন তো—এই দুআটার মধ্যে মূলত কোন জিনিসটা আছিয়া আলাইহাস সালাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে চাচ্ছেন? আমি জানি আমরা অনেকেই বলবো—তিনি আল্লাহর কাছে জান্নাতে একটা ঘর চাচ্ছেন। তা যদিও ঠিক; তবে জান্নাতে 'ঘর' চাওয়ার আগে ওই দুআর মধ্যে তিনি কিন্তু আরও একটা জিনিস চেয়েছেন। এমনকি—জান্নাতে ঘরের আবদার করার আগে ওই আবদারের কথাই তিনি তুলে ধরেছেন সর্বাগ্রে।

ভাবছেন, কোন সে আবদার, তাই তো?

আছিয়া আলাইহাস সালাম দুআর মধ্যে এটা বলেননি যে—'আমার রব, আমার জন্য জান্নাতে একটা ঘর নির্মাণ করুন।' বরং তিনি বলেছেন, 'আমার রব, আপনার নিকটে, জান্নাতে আমার জন্য একটা ঘর নির্মাণ করুন।'

দুআটার আরবি যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখবো, বাক্যটার গঠনে 'ইনদাকা' শব্দটা 'বাইতান ফিল জান্নাহ' শব্দদ্বয়ের আগে এসেছে। 'ইনদাকা' মানে হলো—আপনার নিকটে। জান্নাতে একটা ঘর তো আছিয়া আলাইহাস সালামের লাগবেই, কিন্তু সেই ঘর জান্নাতের যেখানে-সেখানে হলে চলবে না। সেই ঘর হতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছাকাছি।

এই দৃশ্যটা একবার কল্পনা করুন—আপনি আল্লাহর কাছে জান্নাতের কোনোকিছুর আবদার করছেন। সাথে আপনি এ-ও বলে দিচ্ছেন—সেটা যেন আল্লাহর কাছাকাছি থাকে।

আছিয়া আলাইহাস সালামের জান্নাতে একটা ঘর চাওয়ার আগে সেই ঘর ঠিক কোথায় হতে হবে, সেই সীমানাও উল্লেখ করে দেওয়া থেকে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি তাঁর যে অসীম ভালোবাসা আর আবেগ, সেই আবেগের গভীরতা উপলব্ধি করতে পারি।

বস্তুত, জান্নাত লাভের পরও মুমিনের অন্তর পূর্ণ পরিতৃপ্তি পাবে না। মুমিনের অন্তর ঠিক তখনই পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত হবে, যখন সে স্বীয় চোখে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে দেখতে পাবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে নিজের চোখে দেখার পর জান্নাতের সমস্ত নিয়ামতের কথা সে ভুলে যাবে। তার দৃষ্টি যেন সেখানেই নিবদ্ধ হয়ে যাবে অনন্ত সময়ের জন্য। সে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে

থাকবে তার রবের দিকে। চোখের পলক ফেলতে গিয়ে যে কালক্ষেপণটুকু হয়, সেটুকুও সে করতে চাইবে না। সূরা ইউনুসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন :

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

"যারা ভালো কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে সর্বোচ্চ পুরস্কার (জান্নাত) এবং তারও অধিক কিছু।'[৭২]

সর্বোচ্চ পুরস্কার জান্নাত; কিন্তু 'তারও অধিক কিছু' তাহলে কী?

তাফসীরগুলোতে এসেছে—এই আয়াতে মুমিন ব্যক্তির জন্য সর্বোচ্চ পুরস্কার হিশেবে জান্নাতের কথা উল্লেখ করার পর 'তারও অধিক কিছু' বলে যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উল্লেখ করেছেন তা হলো—আল্লাহর দর্শন লাভ।[৭৩] স্বীয় চোখে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে দেখতে পাওয়া। এই প্রাপ্তি জান্নাত লাভের চাইতেও অনেক অনেক বড়!

সহীহ মুসলিম-এর হাদীসে এসেছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যখন জান্নাতের অধিবাসীরা তাতে প্রবেশ করবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তখন বলবেন—'তোমরা কি আমার কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু চাও?'

মুমিন ব্যক্তিগণ তখন বলবে, 'আপনি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেননি? আমাদেরকে দান করেননি জান্নাত আর নিরাপদ করেননি জাহান্নাম হতে?'

অর্থাৎ—এই যে এতো এতো নিয়ামত আপনি আমাদের দান করেছেন, এর চেয়ে বেশি কিছু আর কী থাকতে পারে?

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই হাদীসে বলেছেন, মুমিন ব্যক্তিদের এই কথা শুনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর সামনে থাকা পর্দা সরিয়ে দেবেন। মানুষ তখন বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যাবে! তাদের কাছে মনে হবে—এ যাবৎকালে যতো পুরস্কার তারা পেয়েছে, জান্নাতের সুরম্য দালানকোঠা, কলকল

---

৭২. সূরা ইউনুস, ১০ : ২৬।

৭৩. তাবারি, তাফসীর, ১৫/৬২-৬৩; ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৪/২২৯; আলুসি, রূহুল মাআনি, ৬/৯৭।

ধ্বনির নহর, দিগন্ত বিস্তৃত সবুজাভ মাঠ আর মনোরম সকল আয়োজন—মহামহিম রবের দর্শন লাভের কাছে এসবকিছুই অতিশয় তুচ্ছ।[৭৪]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে দেখতে পাওয়ার মতো সেই আরাধ্য নিয়ামতকে দুনিয়াতেই অনুভব করতে পেরেছিলেন আছিয়া আলাইহাস সালাম। তাই তিনি এমন একটা জায়গায় আল্লাহর কাছে 'ঘর' চেয়েছেন, যেখান থেকে সর্বক্ষণ অনুভব করা যাবে তাঁর উপস্থিতি। যেখানে সর্বক্ষণ থাকা যাবে প্রতিবেশী হিশেবে। তাঁর কাছাকাছি, পাশাপাশি।

বিস্ময়কর এক ভালোবাসা মহান রবের জন্য জমা ছিলো আছিয়া আলাইহাস সালামের অন্তরে। আমাদের অন্তরগুলোতেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য সেই ভালোবাসা মজুদ আছে কি? আমরা কি কখনো চেয়েছি তাঁর প্রতিবেশী হতে, ঠিক আছিয়া আলাইহাস সালামের মতো?

---

৭৪. বিস্তারিত দেখুন—মুসলিম, ১৮১; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৮৯৫৫।

আলো অথবা অন্ধকার

ধরা যাক কুয়াশায় আচ্ছন্ন ঘুটঘুটে এক অন্ধকার রাতে আপনি হাঁটছেন। কোথায় আছেন, সেটা কি কোনো জনপদ না বিরানভূমি, সম্মুখে পাহাড় না নদী—এসবের কোনোকিছুই আপনি বুঝতে পারছেন না। অন্ধকার এতো গাঢ় আর এতো গভীর যে নিজের হাত পর্যন্ত আপনি দেখতে পাচ্ছেন না। ঠিক এমন একটা মুহূর্তে যদি হঠাৎ করে কেউ একটা আলো হাতে আপনার দিকে এগিয়ে আসে, আপনার তখন কী মনে হবে? আপনি ভাববেন—'যাক বাবা! হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেলো এতোক্ষণে। এই নিশুতি অন্ধকারে এই আলোটুকু না পেলে হয়তো কোনো জন্তু-জানোয়ারের পেটেই আজকে চলে যেতাম নির্ঘাত।'

আলো হাতে করে যিনি এগিয়ে আসছেন তার জন্য অধীর অপেক্ষা করে আছেন আপনি। লোকটা আপনার নিকটে এলে তাকে বললেন, 'বাঁচালেন ভাই। কী গভীর অন্ধকার দুনিয়াজুড়ে। ভারি বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম, জানেন? চারদিকে এতো অন্ধকার যে—সম্মুখের রাস্তা খুঁজে পাওয়া তো দূর, চোখের সামনে ধরলে নিজের হাতটুকুও দেখতে পাচ্ছিলাম না। আপনাকে পেয়ে ভারি উপকার হলো। আপনার আলোতে দেখে দেখে বাকি পথটুকু নির্বিঘ্নে পার করা যাবে এবার।'

লোকটা এতোক্ষণ একটা কথাও বললেন না। আপনার কথা বলা শেষ হওয়া মাত্র তিনি বললেন, 'দুঃখিত জনাব! আলোটুকু একান্তই আমার নিজস্ব। এই নিশুতি অন্ধকার রাতের জন্যই এই আলোটুকু আমি সঞ্চয় করে রেখেছিলাম। এই আলোয় পথ চিনে কেবল আমি একাই চলবো, আপনাকে সে আলোতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। আপনি বরং এক কাজ করুন—যেখানে গেলে আলো পাওয়া যায়, সেখানে যান। সেখান থেকে আলো নিয়ে এলে ভবিষ্যতে

এরকম অন্ধকার রাতে আপনাকে আর বিপদে পড়তে হবে না।'

লোকটার এমন প্রতি-উত্তরে আপনি ভীষণ ঘাবড়ে যাবেন নিশ্চয়, তাই না? এতো ঘুটঘুটে অন্ধকার প্রকৃতিজুড়ে, কোথাও কোনো জন-মানবের লেশমাত্র নেই। এমন ঘনঘোর বিপদের দিনে তিনি কি না আপনাকে সামান্য আলোতে পথ দেখাতে নারাজ! আরও বলছেন কি না—যেখানে গেলে আলো পাওয়া যায় সেখানে যেতে। কী নির্মম রসিকতা!

দৃশ্যটা খানিকটা অদ্ভুত এবং খানিকটা গা ছমছমে, তাই না?

সূরা আল-হাদীদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুনাফিক এবং ঈমানদারদের পরকালীন ঠিক এমন একটা অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে—

> يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾
>
> "সেদিন আপনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের দেখবেন। তাদের সামনে ও তাদের ডানে ছুটতে থাকবে আলোর ফোয়ারা। (তাদেরকে বলা হবে) আজ তোমাদের সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে জান্নাতের, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত আছে ঝরনাধারা এবং এতে তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে। এটাই মহাসাফল্য!
>
> সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুমিনদেরকে বলবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা করো, যাতে আমরা তোমাদের প্রাপ্ত আলো থেকে খানিকটা ধার নিতে পারি।' তাদেরকে বলা হবে—'তোমরা বরং পেছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান করো। অতঃপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর, যাতে থাকবে একটি দরোজা। সেই প্রাচীরের ভেতরে থাকবে করুণা এবং বাইরে থাকবে শাস্তি।"[৭৫]

---

৭৫. সূরা হাদীদ, ৫৭ : ১২-১৩।

কিয়ামতের মাঠে প্রত্যেকের অবস্থা যখন সুস্পষ্ট হয়ে যাবে, যখন নির্ধারিত হয়ে যাবে জান্নাত আর জাহান্নামের অধিবাসীদের ব্যাপার—তখন মুমিন নারী এবং পুরুষদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নূর তথা আলো দান করবেন। তাফসীরে এসেছে—ওই সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেওয়া হবে সবকিছু। সে অন্ধকার এতো নিকষ, এতো ঘন আর গাঢ় যে—তার সাথে তুলনা চলে না কিছুর।[৭৬] এমন ঘনঘোর অন্ধকারের দিনে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রিয় বান্দাদের তিনি দান করবেন এমন এক আলো, যা দিয়ে তারা পথ চিনে চলতে পারবে। সেই আলো প্রকাশ পাবে তাদের সামনে থেকে এবং তাদের ডান পাশ থেকে। সে আলোয় পথ চিনে তারা পৌঁছে যাবে তাদের জন্য নির্ধারিত গন্তব্যে।

কিন্তু দুনিয়ার মুনাফিকেরা, যারা দুনিয়ায় মুসলমান সেজে ছিলো; কিন্তু মনপ্রাণ থেকে আল্লাহকে কখনোই ভালোবাসেনি, যারা মুমিনদের সাথেই বসবাস করেছে, সালাত পড়েছে, কুরআন পড়েছে, জিহাদ করেছে; কিন্তু এসবের কোনোটাতেই তারা অন্তর থেকে অংশগ্রহণ করেনি, মুসলমানদের ওপর যখন দুঃখ আর দুর্দশা আপতিত হয়েছে, তারা তখন মনে মনে খুশি হয়েছিলো, তারা ভান করেছিলো মুসলমান হওয়ার, কিন্তু সর্বদা কামনা করতো ইসলামের পরাজয়—এই সমস্ত মানুষগুলোর জন্য সেদিন কোনো আলো বরাদ্দ থাকবে না।

আল্লাহর কাছ হতে প্রাপ্ত আলোয় মুমিনেরা যখন পথ চলতে শুরু করবে, তখন মুনাফিকেরা তাদেরকে বলবে, 'একটু দাঁড়াও আমাদের জন্য। তোমাদের আলো থেকে যাতে আমরাও একটু ধার নিতে পারি।'

তাদের এই আবদারের জবাবে মুমিনেরা তাদের সেদিন কী উত্তর দেবে দেখুন—'তোমরা বরং পেছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান করো।'

তাফসীরে এসেছে—'পেছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান করো' বলে এখানে মূলত মুনাফিকদেরকে উপহাস করা হবে সেদিন। অর্থাৎ মুমিন বান্দারা সেদিন মুনাফিকদের বলবে—'তোমরা বরং দুনিয়ায় ফেরত যাও। সেখানে গিয়ে

---

৭৬. ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৮/১৬; ইবনু আবী হাতিম, তাফসীর, ১০/৩৩৩৭; ওয়াহিদি, আত-তাফসীরুল বাসীত, ২১/২৮৬; সুয়ূতি, আদ-দুররুল মানসূর, ৬/২১০-২১১।

আমাদের মতো আমল করো। ভালো কাজ করো। আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করো। তাহলেই তোমরা আলো পাবে।'[৭৭]

এটা যে অসম্ভব কাজ, তা আল্লাহর মুমিন বান্দারা জানে। কিন্তু মুনাফিকদের সেদিন এতো দুর্গতি আর দুর্দশা হবে যে—তারা সেদিন হয়ে উঠবে উপহাসের পাত্র! তাদের দ্বারা যে আর দুনিয়ার জীবনে ফেরত আসা সম্ভব নয়, দ্বিতীয় কোনো জীবনের অবকাশ যে তাদের জন্য আর বরাদ্দ নেই—এ কথা সকলেই খুব ভালো মতোন জানে। কিন্তু এই উপহাস তাদের প্রতি ফেরত দিয়ে মুমিন বান্দারা তাদের বোঝাবে যে—আজকের এই আলোটুকুর জন্য যখন দুনিয়ায় আমরা সংগ্রাম করছিলাম, যখন আমরা দুনিয়ার ওপরে প্রাধান্য দিয়েছিলাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এবং তাঁর রাসূলের দ্বীনকে, যখন কুরআন আর সুন্নাহর রঙে আমরা রাঙিয়ে নিচ্ছিলাম আমাদের জীবন—তখন তোমরা আমাদের দেখে হাসতে। আমাদেরকে নিয়ে উপহাস করতে। আমাদের দুঃখ আর দুর্দশা দেখে তোমরা আনন্দ পেতে। আজকের এই যে আলো—এই আলো দুনিয়ার আমাদের সেই ত্যাগ, সেই সংগ্রাম আর সেই ধৈর্যের ফল। এটা একেবারেই আমাদের নিজস্ব। কেন আজ তা থেকে তোমাদের ভাগ দেবো?

কুরআনের পরবর্তী ভাষ্যমতে— তারপর মুনাফিক এবং মুমিনদের মাঝে একটা প্রাচীর তৈরি যাবে এবং সেই প্রাচীরে থাকবে একটি দরোজাও। সেই প্রাচীরের যে পাশে আল্লাহর মুমিন বান্দারা অবস্থান করবে, তাতে থাকবে করুণার ফল্গুধারা—জান্নাত! আর অন্য যে পাশে মুনাফিকেরা অবস্থান করবে, সে পাশে থাকবে ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা—জাহান্নাম! একটা প্রাচীর তাদের মধ্যে গড়ে দেবে যাবতীয় পার্থক্য!

এই আয়াতটা একদিকে যেমন আশা-জাগানিয়া, অন্যদিকে ততোটাই ভয়ংকর! আল্লাহর রাস্তায় যারা নিজেদের জীবন কাটায়, যারা দুনিয়াতে আল্লাহর জন্য বাঁচে এবং আল্লাহর রঙে রাঙিয়ে নেয় নিজেদের জীবন—তাদের জন্য মহা-সুসংবাদ আছে এখানে। অন্যদিকে যারা দুনিয়ার জীবনকে খেল-তামাশায় অপচয় করে, যারা আল্লাহর দ্বীনকে ধারণ করতে পারে না নিজেদের হৃদয়ে, কী এক মহা দুঃসংবাদ তাদের জন্য!

---

৭৭. ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৮/১৭; ইবনু আবী হাতিম, তাফসীর, ১০/৩৩৩৭; বাইহাকি, আল-আসমা ওয়াস সিফাত, ২/৪৩৫।

মুনাফিকদের প্রতি, অর্থাৎ যারা সেদিন আল্লাহর দেওয়া আলো থেকে বঞ্চিত হবে, মুমিন বান্দাদের প্রতি-উত্তরটা খেয়াল করুন—'পেছনে ফিরে যাও এবং আলো নিয়ে আসো।'

মৃত্যু আমাদের জীবনের চরমতম সত্য। আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি—আখিরাতের পাথেয় গোছানোর জন্য আমাদের সামনে এই একটাই সুযোগ। এটাই প্রথম এবং সর্বশেষ। পুনর্জন্ম বা পরজন্ম জাতীয় ধারণা ইসলামে নেই। পরকালের সেই ঘনঘোর অন্ধকারের দিনে যদি আমরা আলো পেতে চাই, আমাদেরকে তার সংস্থান এই দুনিয়ার জীবন থেকেই করে যেতে হবে। যদি আমরা তা করতে ব্যর্থ হই, সেদিন কি সেই উপহাসের বাণীটুকু আমাদেরও শুনতে হবে না—'যাও, দুনিয়ায় ফিরে যাও। সেখান থেকে আলো জোগাড় করে নিয়ে আসো।'

এই যে আমাদের যাবতীয় অবহেলা, যাবতীয় উদাসীনতা জীবন আর মৃত্যুকে ঘিরে—এর চরম মূল্য কি সেদিন দিতে হবে না? কতো দিব্যি কেটে যাচ্ছে আমাদের দিন আর রাত, কতো অনায়াসে ফুরিয়ে যাচ্ছে হায়াতের দিনগুলো—কিন্তু কোথাও কি আমাদের কোনো ভাবাবেগ আছে? একান্ত নিরালায় বসে নিজেদের আখিরাতের জীবন নিয়ে ভাবার খানিকটা ফুরসত আমরা পাই? কখনো আনমনে হলেও নিজেকে কি প্রশ্ন করি—যেভাবে কেটে যাচ্ছে একটা জীবন, আদৌ কি সেভাবে কাটার কথা?

সেদিন একদল লোক, যারা আমাদেরই প্রতিবেশী, যাদের আমরা চিনতাম, যারা হয়তো আমাদের চোখে ছিলো নিতান্তই ধার্মিক—আলো হাতে করে অভ্যর্থনা পেতে পেতে এগিয়ে চলবে। আমাদের অনেকে হয়তো সেদিকে চেয়ে চেয়ে দেখবো আর বলবো—'দাঁড়াও, একটু আলো ধার নিই তোমাদের কাছ থেকে।'

কিন্তু সেদিন তো কাউকে কোনোকিছু ধার দেওয়ার দিন নয়। সেদিন শুধুই উদযাপন আর পরিতাপের দিন। হয় বাঁচো নয় মরো। একদল আলো পেয়ে উদযাপন করবে, অন্যদল আলো না পেয়ে অন্ধকারের তলে মিলিয়ে গিয়ে পরিতাপ করবে।

চলুন বসে ভাবি, কোন পথে চলেছে আমাদের জীবন—আলো, না অন্ধকারে?

নূহের প্লাবন এবং ভাবনার অলিগলি

১

২০২২ সালে সিলেটের যে বন্যাটা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম সেটা আমাদের প্রজন্ম তো বটেই, আমাদের দুই প্রজন্ম, অর্থাৎ আমাদের বাপ-দাদাদের প্রজন্মও এতো ভয়াবহ বন্যা দেখেননি বলেই ধারণা করি। ৭৪ আর ৮৮'র যে দুই ভয়ংকর বন্যার খবর আমরা জানতে পারি, সেই বন্যাগুলোর তুলনায় এবারের বন্যাটা অনেক বেশি আতঙ্কের এবং ভয়াবহ ছিলো নিঃসন্দেহে।

এই ভয়াবহ বন্যার যাদের প্রাণহানি ঘটেছে, তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। যাদের যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেসব ক্ষয়ক্ষতির বদলে উত্তম বিনিময় যেন তারা পায় আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে সেই প্রার্থনা। এবং আরও দুআ করি—এমন দুর্যোগ আর দুর্বিপাকের হাত থেকে মহান রব যেন আমাদের অনুগ্রহ করে হেফাযত করেন।

২

বিপদ কেটে যাওয়ার পর আল্লাহকে ভুলে যাওয়া, গুনাহের জীবনে ফেরত যাওয়া এবং বিপদের দিনের অসহায়ত্বের কথা বেমালুম ভুলে যাওয়ার রোগ মানুষের মজ্জাগত। এই দাবিটা কুরআনেও আমরা দেখতে পাই :

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّيٓ ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ

"আর যদি তার ওপরে আসা দুঃখ কষ্টের পরে তাকে আমার নিয়ামত দান করি, তখন সে অবশ্যই অবশ্যই বলবে, 'আমার দুঃখের দিন তো কেটে গেছে! তখন সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে পড়ে আর হয়ে পড়ে অহংকারী।"[৭৮]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনুগত বান্দাদের উচিত প্রতিটা দুর্যোগ, জীবনের প্রতিটা পরীক্ষা থেকে শিক্ষা নেওয়া।। দুর্যোগ নেমে এলে হা-হুতাশ করা, দুর্যোগ কেটে যাওয়ার পর মৌজ-মাস্তিতে মেতে ওঠা—এমন মনস্তত্ব মুসলিম জীবনের দর্শন হতে পারে না।

৩

এই ধরণী তার সৃষ্টি পরিক্রমায় যতোগুলো বন্যা অবলোকন করেছে, তার মধ্যে ভয়াবহতম বন্যা ছিলো নূহ আলাইহিস সালামের সময়কার বন্যাটাই যাকে আমরা 'নূহের প্লাবন' হিশেবে জানি।

সিলেটের স্মরণকালের ভয়াবহতম বন্যায় ডুবে গেছে মানুষের ঘরবাড়ি, তলিয়ে গেছে অসংখ্য জনপদ; কিন্তু নূহ আলাইহিস সালামের কওমের ওপরে শাস্তিস্বরূপ আযাব হিশেবে যে বন্যা আপতিত হয়েছিলো, তাফসীরকারকদের মতে—সেই বন্যার পানি উঁচু পর্বতমালা তো বটেই, তারও আশি হাত ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিলো![৭৯] ভাবতে পারেন কী কল্পনাতীত একটা ভয়ংকর দৃশ্য ছিলো সেটা?

৪

নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর কওমকে অনেক অনেক বছর দ্বীনের দাওয়াত দেন।

---

৭৮. সূরা হূদ, ১১ : ১০।

৭৯. বিস্তারিত দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৪/৩২৩; যুহাইলি, আত-তাফসীরুল মুনীর, ১২/৭৫।

কিন্তু অবাধ্য কওম তাঁর ডাকে কোনো সাড়াই দিতে চায় না। তারা আল্লাহর নবি নূহ আলাইহিস সালামকে অত্যাচার-নির্যাতন করে, তাঁর দাবিকে অস্বীকার করে এবং তাঁর নুবুওয়াতের ব্যাপারে যা খুশি তা বলতে থাকে। অবাধ্যতার চূড়ান্ত প্রকাশ যাকে বলে! তাদের সেই ক্রমাগত অত্যাচার-নির্যাতন, নিরন্তর অবাধ্যতা এবং সীমা লঙ্ঘনের কারণে তাদের ওপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আযাব আসাটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নূহ আলাইহিস সালামকে একটা নৌকা বানানোর আদেশ দিলেন। তাঁর চূড়ান্ত ফায়সালা—বানের পানিতে তিনি ডুবিয়ে মারবেন এই অবাধ্য জাতিটাকে!

নৌকা বানানোর কাজে লেগে পড়লেন নূহ আলাইহিস সালাম। কিন্তু এমন কড়কড়ে রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে, এমন শুষ্ক আবহাওয়ার সময়ে বানের পানি থেকে বাঁচতে নৌকা বানাতে দেখে নূহ আলাইহিস সালামকে ঠাট্টা করতে শুরু করেছিলো কাফিরেরা।

> وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ
>
> "নূহ নৌকা তৈরি করছিলো। আর যখনই তার জাতির প্রধান ব্যক্তিরা নূহের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো, তারা তাঁকে নিয়ে উপহাসে মেতে উঠছিলো।"[৮০]

তাদের মনে হয়তো এই ভাবনার উদয় হয়েছিলো যে—আরেহ! কী সুন্দর আবহাওয়া প্রকৃতিতে বিরাজ করছে, আর এই লোকটা এসেছে আমাদেরকে বানের জলের গল্প শোনাতে! পাগল নাকি!

তারা হয়তো আরও ভেবেছে—ধরে নিলাম অঝোর ধারার বৃষ্টি হবে। কিন্তু তাই বলে কি নৌকায় উঠে সেই বৃষ্টি থেকে বাঁচতে হবে আমাদের? আমাদের ঘরগুলো কি ডুবে যাবে নাকি? এমনটা হয়েছে কখনো? এমন ঘটনা না আমরা দেখেছি আর না আমাদের বাপ-দাদারা দেখেছে কোনোদিন!

ভাবনা মিথ্যে নয়। নূহ আলাইহিস সালামের কওম কেবল নয়, তাঁর আগের কোনো জাতিই এতো ভয়াবহতম বন্যা অবলোকন করেনি এবং কিয়ামতের

---

৮০. সূরা হূদ, ১১ : ৩৮।

আগে হয়তো আর কোনো জাতি সেটা অবলোকন করবে না। যেহেতু এমনকিছু যে ঘটতে পারে সেই অভিজ্ঞতা তাদের কাছে ছিলো না, তাই নূহ আলাইহিস সালামকে এমন কড়কড়ে রোদে কাল্পনিক বৃষ্টি আর বন্যার কথা ভেবে নৌকা বানাতে দেখে উপহাস করতে শুরু করে তারা।

তাফসীর থেকে জানা যায়—নূহ আলাইহিস সালাম গোটা একশ বছর ধরে সেই নৌকা বানিয়েছিলেন। অর্থাৎ—যেদিন থেকে নূহ আলাইহিস সালাম সেই নৌকা বানানো শুরু করেছিলেন, তার আরও একশ বছর পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আযাবের সেই বন্যা নূহ আলাইহিস সালামের কওমকে গ্রাস করেছিলো।[৮১]

এই জায়গায় একটা চমৎকার ব্যাপার আমার মাথায় এলো। সেই নৌকাটা বানাতে যেহেতু নূহ আলাইহিস সালামের একশ বছর লেগেছিলো, তাহলে গোটা একটা শতাব্দী ধরে কাফিরদের ঠাট্টা-মশকারি, লাঞ্ছনা আর উপহাস তাঁকে কি সহ্য করে যেতে হয়নি? অবশ্যই হয়েছে। যদি রাতারাতি সেই আযাব চলে আসতো, যদি নূহ আলাইহিস সালাম নৌকা বানানোর কাজে হাত দেওয়া মাত্রই প্রকৃতিতে নেমে আসতো অঝোর ধারার বর্ষণ, তাহলেও নূহ আলাইহিস সালামের সতর্কবার্তাকে খানিকটা হলেও সত্য মনে করতো তারা। খুব বেশি উপহাস করতে পারতো না। কিন্তু গোটা একশ বছর যেখানে লেগে গেলো, এতো লম্বা একটা সময় ধরে যে উপহাস, বিদ্রুপ আর তিরস্কারের ভেতর দিয়ে নূহ আলাইহিস সালামকে যেতে হয়েছে তা কি কল্পনা করা যায়?

কিন্তু দেখুন—সেই লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, উপহাস, বিদ্রুপ আর তিরস্কারের বিপরীতে কী সীমাহীন ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে গেলেন নূহ আলাইহিস সালাম! ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়া বলে একটা কথা আছে। নূহ আলাইহিস সালামের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙা তো দূর, কখনো সেই বাঁধের একটা বালুকণাও নড়চড় করেনি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতিশ্রুত আযাব আসতে এতো সুদীর্ঘ সময় লেগে গেলেও, তিনি কখনোই প্রশ্ন করে বসেননি যে—ইয়া আল্লাহ, আপনি তো বলেছেন এই কাফিরদের জন্য আযাব পাঠাবেন। কিন্তু এতোগুলো বছর হয়ে গেলো তবুও আপনার কোনো আযাব এদের ওপর আপতিত হলো না এখনো।

---

৮১. তাবারি, তাফসীর, ১৫/৩১৭; ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৪/৩১৯; কুরতুবি, তাফসীর, ৯/৩১; বাগাবি, তাফসীর, ৪/১৭৫।

এরা তো আমাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে তাদের তিরস্কার আর বিদ্রুপে। মাবূদ, করে পাঠাবেন আপনার সেই প্রতিশ্রুত আযাব?

কখনোই নয়! নূহ আলাইহিস সালাম একটাবারের জন্যও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে এভাবে বলেননি। আল্লাহর প্রতিশ্রুত আযাব আসতে সুদীর্ঘ সময় লেগেছে ঠিক, এরই মধ্যে কাফিরেরা তাঁকে উপহাস, তিরস্কার আর বিদ্রুপে জর্জরিত করেছে সেটাও ঠিক, কিন্তু সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করে তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ওপর ভরসা করে ছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কখন সেই আযাব পাঠাবেন, সেই সময়ের দিকে চাতক পাখির মতো তাকিয়ে থেকেছেন।

জীবনে আমরাও আল্লাহর নিয়ামত লাভের জন্য চাতক পাখির মতো তাকিয়ে থাকি। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে জীবনের দরকারে এটা-ওটা লাভের দুআ করি। কিন্তু যখনই আমাদের প্রত্যাশিত বস্তু লাভে আমরা ব্যর্থ হই কিংবা সেই বস্তু আমাদের হস্তগত হতে সময় লেগে যায়, আমরা তখন ব্যাকুল হয়ে উঠি। আমরা হাপিত্যেশ করে বলি, 'আহা! আল্লাহ কেন যে আমার দুআ কবুল করেন না! কেন যে তিনি আমার ডাকে সাড়া দেন না!'

চিন্তা করে দেখুন—নূহ আলাইহিস সালামকে যে আযাবের প্রতিশ্রুতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দিয়েছেন তা পাঠিয়েছেন আরও একশ বছর পরে, কিন্তু কাফিরদের নিরন্তর উপহাস সত্ত্বেও এতে নূহ আলাইহিস সালামের কোনো হাপিত্যেশ কিংবা কোনো তাড়াহুড়ো ছিলো না। তিনি ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করে গেছেন। কিন্তু আমরা—আমাদের প্রত্যাশিত বস্তু আজকে চেয়ে কালকে না পেলে অস্থির হয়ে যাই। পেরেশানিতে ঘুমোতে পর্যন্ত পারি না। আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর নূহ আলাইহিস সালামের যে সীমাহীন ভরসা ছিলো, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সেই ভরসার ছিটেফোঁটা আছে কি?

আয়াতখানা থেকে আরও একটা ব্যাপার আমাদের শিখবার আছে—নূহ আলাইহিস সালাম যখন নৌকাটা বানাচ্ছিলেন, তখন কাফিরেরা তাঁকে উপহাস করে নানান কথা বলছিলো। তাদের উপহাসের জবাবে কী বলেছিলেন নূহ আলাইহিস সালাম? তিনি কি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন? রেগেমেগে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন?

এর কোনোটাই নয়। তাদের উপহাসের পাল্টা জবাব হিশেবে তিনি শুধু বলেছিলেন—

إِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ﴿٣٨﴾

> "যদি তোমরা আজ আমাদের ঠাট্টা করো, তাহলে তোমাদেরকেও ভবিষ্যতে আমরা ঠাট্টা করবো যেমনভাবে আজ তোমরা ঠাট্টা করছো।"[৮২]

তিনি কাফিরদের সাথে গলা চড়িয়ে বিতর্কে জড়াননি। তিনি শুধু প্রতিশ্রুত আযাবের কথা স্মরণ করে বলেছিলেন—যে আযাবের সংবাদ আমার কাছে এসেছে, সেটা অবশ্যই সত্য এবং সমাগত। আজ তোমরা ঠাট্টা করছো আমাদের, কিন্তু সেই আযাব যখন চলে আসবে, তোমাদের অবস্থা সেদিন এতো করুণ হবে যে—আমরা যদি তোমাদের জন্য খানিকটা আফসোসও করি, সেই আফসোস দেখার মতো অবস্থাতেও তোমরা থাকবে না। কতো নিদারুণ সেই অবস্থা! বাস্তবিক অর্থে এর চেয়ে করুণ উপহাস আর কী হতে পারে?

জীবনের চলতি পথে যারা আমাদের সাথে অন্যায় আর অবিচার করে, তাদের সাথে তর্ক-বিতর্কে জড়ানো কোনোভাবে উচিত নয়। সমীচীন নয় তাদের সাথে ঝগড়াবিবাদে জড়ানো, কাদা ছোড়াছুড়ি করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একটা নাম হলো আল-আদল তথা ন্যায়-বিচারক। নূহ আলাইহিস সালামের সাথে তাঁর কওম যে অন্যায় করেছিলো, তা আল্লাহর অগোচরে থাকেনি। তিনি নূহ আলাইহিস সালামের জন্য ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমাদের সাথে যারা অন্যায় করে, যারা আমাদের সরলতা আর বিশ্বস্ততার সুযোগ গ্রহণ করে আমাদেরকে ফাঁদে আটকাতে চায়, তাদের প্রতি আমাদের জবাব হবে একটাই—তোমার ফায়সালা আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করে দিলাম। নিশ্চয় তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।

আজ যারা আপনাকে নিয়ে উপহাসে মত্ত হচ্ছে, আজ যাদের কাছে আপনি বিদ্রুপ আর তিরস্কারের বস্তু—এসবকিছুর ফায়সালা আল্লাহর ওপরে ন্যস্ত করে দিন। আল্লাহর ওপরে যদি ভরসা করতে পারেন, বিশ্বাস করুন তাঁর ফায়সালায়

---

৮২. সূরা হূদ, ১১ : ৩৮।

আপনি এতোটাই তুষ্ট হবেন যে—নিন্দাকারীদের দিকে একটু যে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন, সে অবস্থাও তাদের থাকবে না।

৫

আয়াতের পরম্পরায় নূহ আলাইহিস সালামের জীবন থেকে আমরা আরও একটা জিনিস শিখতে পারি। প্লাবনের জন্য নৌকা তৈরি হলো সুদীর্ঘ সময় ধরে। এরপর একদিন সত্যি সত্যিই প্লাবনের বৃষ্টিপাত আরম্ভ হলো। যখন ভেসে যেতে লাগলো লোকালয়ের পর লোকালয়, তখন নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর অনুগত অনুসারীদের ডেকে বললেন,

> ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
>
> "তোমরা এতে আরোহণ করো। আল্লাহর নামের ওপরেই হবে এর গতি এবং স্থিতি।"[৮৩]

খেয়াল করুন—মানব সভ্যতার ইতিহাসে নূহ আলাইহিস সালামের মাধ্যমেই প্রথম নৌকার প্রচলন শুরু হয় বলে তাফসীরকারকেরা মন্তব্য করেছেন। একজন মানুষ এমন একটা যন্ত্র বানিয়েছেন, যা দুনিয়া ইতঃপূর্বে কখনো দেখেনি। সম্পূর্ণ নতুন এই আবিষ্কার পুরোটাই হয়েছে নূহ আলাইহিস সালামের হাত ধরে। এমন নতুন এবং অতি-বিস্ময়কর বস্তু বানানোর পরেও অহংকারে ফেটে পড়েননি নূহ আলাইহিস সালাম। তিনি তাঁর সমালোচনাকারীদের কাছে গিয়ে বলেননি, 'দেখেছো, কী বস্তু বানিয়ে ফেলেছি আমি? সাধ্য আছে তোমাদের এমন কিছু বানাবার?'

অনুসারীদের কাছে তিনি সাজতে যাননি মহান আবিষ্কারক। কাউকে ডেকে, উৎসব-আয়োজন করে তিনি মুহূর্তটাকে উদযাপন করেননি।

তিনি কী করেছেন, তাহলে?

তিনি নৌকায় ওঠার আগে তাঁর অনুসারীদের বলে দিয়েছেন—'এতে ওঠো।

---

৮৩. সূরা হূদ, ১১ : ৪১।

আল্লাহর নামেই হবে এর বয়ে চলা এবং থেমে যাওয়া।'

অর্থাৎ—আল্লাহ যেভাবে চাইবেন, এটা সেভাবেই চলবে। আর তিনি যেখানে এটাকে থামানোর ইচ্ছা করবেন, এটা সেখানেই থামবে।'

তিনি বলতে পারতেন—'যেহেতু আমি এটা বানিয়েছি, এটা কোথায় থামবে, কীভাবে থামবে, কীভাবে চলবে আর কতোদূর চলবে সব আমার নখদর্পণে। তোমাদের ওসব নিয়ে এতো চিন্তা করতে হবে না।'

নূহ আলাইহিস সালাম সেভাবে বলেননি। তিনি তাঁর কৃতিত্বের সবটুকু অংশ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দিকে সোপর্দ করেছেন। যদিও কাজটা তিনি নিজের হাতে করেছেন, তথাপি আল্লাহর অনুগ্রহ, দয়া, ভালোবাসা আর নির্দেশনা ব্যতীত কাজটা করা যে তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিলো—তা তিনি জানতেন। আর জানতেন বলেই কৃতিত্বের সবটুকু সোপর্দ করে দিয়েছেন মহান রবের দিকেই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সত্যিকার বান্দা, যাদের অন্তরে রয়েছে রবের জন্য অপরিসীম দরদ আর ভালোবাসা, যাদের হৃদয় টইটম্বুর তাকওয়ায়, জীবনের চলতি পথের সমস্ত অর্জনকে তারা আল্লাহর দিকেই সোপর্দ করে দেয়। কৃতজ্ঞ বান্দারা জানে—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি না চান, একটা ধুলো বাতাসে উড়ানোর ক্ষমতাও তাদের হবে না। এই ধ্রুব সত্য জানে বলেই জীবনের সমস্ত প্রাপ্তিকে তারা আল্লাহর দয়া আর করুণার চোখ দিয়ে দেখতে পারে।

জীবনের সমস্ত অর্জনকে আমরা যখন কেবল আল্লাহর দয়া আর ভালোবাসা হিশেবে দেখতে শিখবো, প্রাপ্তি এবং অর্জনের দিনগুলোতে আমরাও নূহ আলাইহিস সালামের মতো করে বলতে পারবো—'এটা তো আমাদের রবের অনুগ্রহ। তিনি ইচ্ছা করে করেছেন বলেই পেয়েছি। তিনি চাইলে এই অনুগ্রহ আবার আমার কাছ থেকে নিয়েও নিতে পারেন। সমস্ত প্রশংসা কেবল আমার রবের।'

সে মহান পরাজয়ে

১

মূসা আলাইহিস সালামের জীবনালোচনা থেকে আমরা অনেকগুলো চরিত্রের সন্ধান পাই—আছিয়া আলাইহাস সালাম, হারূন আলাইহিস সালাম, খিযির আলাইহিস সালাম, যুলকারনাইন আলাইহিস সালাম, মাদইয়ানে সাক্ষাৎ হওয়া সেই দুই নারী এবং তাদের বয়োবৃদ্ধ পিতাসহ আরও অনেক। তাদের সকলের জীবন এবং কর্ম আমাদের উদ্দীপ্ত করে। একটা আলোময় জীবন গড়ার অনেক রসদ আমরা খুঁজে পাই তাদের জীবনাচারে। কিন্তু নবি মূসা আলাইহিস সালামের জীবনে আসা একটা চরিত্র একেবারে পাদপ্রদীপের আলোর বাইরে থেকে যায়। আপনি কি জানেন কোন সেই চরিত্র, যার দিকে আমরা খুব বেশি নজর দিই না?

হ্যাঁ, সেটা হলো ফিরআউনের সেই জাদুকর।

নবি মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুটো মু'জিযা দিয়ে ফিরআউনের কাছে পাঠালেন। মু'জিযা দুটো হলো—একটা লাঠি যা হাত থেকে রাখলেই বিশালকার একটা সাপে পরিণত হয়, এবং তিনি যখন এক হাত গলাবন্ধের ভেতরে ঢুকিয়ে পুনরায় বের করেন, তখন তাঁর হাত থেকে উজ্জ্বল আলোকরশ্মি বের হতে থাকে। এ-ধরনের দুটো মু'জিযা দান করার কারণ হলো—ওই সময়ে মিশরে জাদুবিদ্যার প্রভাব খুব তুঙ্গে। চারদিকে জাদুকরদের জয়জয়কার। ছোট থেকে বড় সকলে জাদুর মোহে আচ্ছন্ন। তাই নবি মূসা আলাইহিস সালামকেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমনকিছু দিলেন, যা আদতে জাদু নয়; কিন্তু দেখতে মনে হবে এ এক বিস্ময়কর জাদুর খেল, যা দুনিয়াতে ইতঃপূর্বে কেউ দেখেনি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন নবি-রাসূলদের মু'জিযা দান করেন, তখন তা সময়ের প্রেক্ষাপট বিবেচনা

করেই দেন। মূসা আলাইহিস সালামকে হাত আলোকময় করা আর লাঠিকে সাপে পরিণত করার শক্তি দান করলেন; কারণ ওই সময়ে জাদুবিদ্যাই ছিলো সবচেয়ে চর্চিত এবং আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা একটা বিষয়। ঈসা আলাইহিস সালামের সময়ে ছিলো চিকিৎসাবিদ্যার জয়জয়কার। তাই ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দিয়েছিলেন কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করা আর অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে যেহেতু ভাষাতত্ত্বের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিলো, তাই কুরআন নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে এমন এক মু'জিযা দান করলেন, যার সমতুল্য ভাষার অলঙ্কার তৎকালীন সময় তো বটেই, আজ পর্যন্ত কোথাও কেউ দেখাতে পারেনি।

লাঠি এবং হাতকে সমুজ্জ্বল করতে পারার মতো দুটো মু'জিযা নিয়ে মূসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর ভাই হারূন আলাইহিস সালাম ফিরআউনের কাছে আসলেন। ফিরআউনের কাছে এসে তিনি বললেন :

> يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٠٥﴾
>
> "হে ফিরআউন! আমি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূল। আমার জন্য অবশ্য করণীয় এই যে—আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত আর কিছুই আমি বলি না। তোমাদের রবের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণসহ আমি তোমাদের কাছে আগমন করেছি। কাজেই বনি ইসরাঈল সম্প্রদায়কে তুমি আমার সাথে যেতে দাও।"[৮৪]

মূসা আলাইহিস সালাম নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল দাবি করেছেন এবং এ-ও বলেছেন যে—তিনি স্পষ্ট প্রমাণসহ আগমন করেছেন। কিন্তু হতচ্ছাড়া ফিরআউন এমন কথায় ভুলবে কেন! সে বললো,

> إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٦﴾
>
> "বাস্তবিকই যদি তুমি স্পষ্ট দলিল ও কোনো নিদর্শন এনে থাকো, তাহলে সেগুলো পেশ করো যদি তুমি সত্যবাদী হও।"[৮৫]

---

৮৪. সূরা আ'রাফ, ৭ : ১০৪-১০৫।

৮৫. সূরা আ'রাফ, ৭ : ১০৬।

এরপর মূসা আলাইহিস আলাইহিস সালাম তাঁর হাতে থাকা লাঠিটা মাটিতে নিক্ষেপ করলেন এবং সাথে সাথে তা এক বিশালকার অজগর সাপে পরিণত হলো। আর তাঁর হাত গলাবন্ধের মধ্যে ঢুকিয়ে পুনরায় বের করলে তা থেকে ঠিকরে বের হতে লাগলো শুভ্রোজ্জ্বল আলো।

সাধারণত জাদুকরেরা একটা মোহ-মায়া সৃষ্টি করে দর্শকদের চোখে ধুলো দেয়। তারা এমন মায়াজাল তৈরি করে যাতে বিভ্রান্ত হয় দর্শক। কিন্তু মূসা আলাইহিস সালাম যা দেখালেন, তা না কোনো জাদু, আর তা না কোনো মায়াজাল। এটা যে জাদুমন্ত্রের কাজ নয় সেটা সাধারণ জনগণেরও বুঝতে বেগ পাওয়ার কথা নয়, যেহেতু তারা সকলে জাদুর মায়াজালের প্রভাব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। উপস্থিত জনতা যাতে মূসা আলাইহিস সালামের দলে ভিড়ে যেতে না পারে, সেহেতু ফিরআউনের সভাসদের প্রধানেরা উল্টো চাল চেলে দিলো। তারা ব্যাপারটাকে ঘুরিয়ে দিলো রাজনৈতিক মোড়ে। তারা বললো :

إِنَّ هٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾

"এ তো এক সুদক্ষ জাদুকর।"[৮৬]

খেয়াল করে দেখুন—ফিরআউনের সভাসদ প্রধানেরা মূসা আলাইহিস সালামের মু'জিযা দেখে তাঁকে শুধু 'জাদুকর' বলেনি, বরং তারা নবি মূসাকে 'সুদক্ষ জাদুকর' বলে অভিহিত করেছে। তার মানে—মূসা আলাইহিস সালামের দেখানো মু'জিযা অবশ্যই আলাদা এবং স্বতন্ত্র। এমন স্বতন্ত্রতা ওরা কখনোই দেখেনি এবং এমন ক্ষমতাও যে কারও থাকতে পারে, তা-ই ওদের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার! মূসা আলাইহিস সালাম যা করেছেন তা যে এক অনন্য, অসাধারণ, অভূতপূর্ব কাজ তা ওই সভাসদ প্রধানেরাও জানে। কিন্তু নবি মূসার কাছে তারা হার মানবে কেন? ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দিতে তড়িঘড়ি করে তারা বললো, 'আরেহ! এ দেখছি এক বিরাট জাদুকর!'

তারা মূসা আলাইহিস সালামকে কেবল সুদক্ষ জাদুকর বলেই থামেনি, উপস্থিত লোকেদের উদ্দেশ্য করে আরও বলেছে,

---

৮৬. সূরা আ'রাফ, ৭ : ১০৯।

يُرِيْدُ أَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُوْنَ ﴿١١٠﴾

"সে তো তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। তার ব্যাপারে তোমাদের সিদ্ধান্ত কী?"[৮৭]

সভাসদদের কথার প্রতি-উত্তরে সম্প্রদায়ের লোকেরা পরামর্শ দিলো। তারা বললো—এই ব্যক্তি যদি জাদুকর-ই হয় এবং জাদুমন্ত্র করে সে যদি আমাদের দেশ দখল করতে চায়, তাহলে তাকে মোকাবিলা করা আমাদের পক্ষে কঠিন কিছু নয়। এক কাজ করা যাক—গোটা দেশ থেকে খুঁজে বের করা হোক সকল বড় বড় জাদুকরদের। এরপর তাদের সাথে প্রতিযোগিতা হোক মূসা ও তাঁর ভাই হারূনের। আমাদের দেশের জাদুকরদের সাথে জাদুতে হেরে গেলে তারা আর আমাদের দেশ দখলের ষড়যন্ত্র করতে পারবে না।

সম্প্রদায়ের লোকেদের এই পরামর্শ শোনা হলো। গোটা দেশ থেকে ডাক-ঢোল পিটিয়ে হাজির করা হলো দেশের সবচেয়ে সেরা জাদুকরদের। তাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হলো ফিরআউনের রাজকীয় প্রাসাদে। মূসা এবং হারূন আলাইহিমাস সালামের পরাজয় দেখবার জন্য গোটা দেশ তখন উন্মুখ হয়ে আছে।

দেশসেরা জাদুকরেরা এলো মূসা আলাইহিস সালামের সাথে প্রতিযোগিতা করতে। কিন্তু প্রাসাদে পা রেখেই তারা ফিরআউনের কাছে কী জানতে চাইলো, জানেন? তারা বললো :

إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِيْنَ ﴿١١٣﴾

"আমরা যদি বিজয়ী হই, তাহলে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকছে তো?"[৮৮]

প্রতিযোগিতা শুরুও হয়নি। প্রতিপক্ষের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কেও কিছু জানে না। কিন্তু সবকিছুর আগে তারা শুরু করে দিয়েছে দর কষাকষি। ফিরআউনও বাদ যায় না। সে তো মূসা আলাইহিস সালামের শক্তি সম্পর্কে জেনে গেছে ইতোমধ্যেই। নবি মূসা যদি সত্যিই দেশ দখল করতে আসতেন কিংবা তাঁর যদি

৮৭. সূরা আ'রাফ, ৭ : ১১০।

৮৮. সূরা আ'রাফ, ৭ : ১১৩।

থাকতো সম্পদের কোনো লোভ, তাহলে ফিরআউনের তাঁকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ ছিলো না। কারণ দুজন ব্যক্তির সাথে সম্মুখ সমরে যাওয়ার যাবতীয় শক্তিমত্তা মজুদ আছে তার। আছে অঢেল সম্পদের বহর। নবি মূসা যা চাইবেন, তা দিতে সে রাজি হয়ে যাবে। কিন্তু মূসা আলাইহিস সালাম তো তার কোনোটাই চান না। তিনি নিয়ে এসেছেন এক আসমানি পয়গাম। তাঁর সাথে আছে স্বয়ং বিশ্ব জাহানের অধিপতি। এমন বার্তা নিয়ে যে হাজির হয়েছে, তাঁকে হারানোর সাধ্য কোথায় ফিরআউনের? তাই জাদুকরেরা যখন আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো—মূসাকে হারাতে পারলে আমাদের পুরস্কার দেবেন কি? ফিরআউন তখন উদাত্তভাবে বললো :

نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾

"হ্যাঁ, আর তোমরা আমাদের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[৮৯]

জাদুকরেরা কেবল পুরস্কার পাবে কি না জানতে চাইলো, ফিরআউন বললো পুরস্কার তো দেবেই, সাথে তাদেরকে রাজসভার গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন করে দেবে। কীরকম মরিয়া হয়ে ফিরআউন নবি মূসা আলাইহিস সালামকে পরাজিত করতে চাইছে, ভাবুন!

এরপর প্রতিযোগিতার দিন সামনে এলো। ফিরআউনের জাদুকরেরা মূসা আলাইহিস সালামকে উদ্দেশ্য করে বললো,

يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾

"হে মূসা, প্রথমে তুমি শুরু করবে, নাকি আমরা শুরু করবো?"[৯০]

মূসা আলাইহিস সালাম তাদেরকেই শুরু করতে বললেন। জাদুকরেরা তাদের হাতে থাকা লাঠিগুলোকে মাটিতে নিক্ষেপ করলো এবং মুহূর্তে সৃষ্টি করলো একধরনের সম্মোহনী মায়া। তারা জাদু করলো উপস্থিত সকলের চোখে, যাতে সকলে তাদের তন্ত্র-মন্ত্রে বিভ্রান্ত হয়। সেই সম্মোহনী শক্তির প্রভাবে লোকজনের কাছে মনে হলো যেন জাদুকরদের ছুঁড়ে ফেলা লাঠিগুলো বিশাল বিশাল সাপে পরিণত হয়ে এদিক-সেদিক ছুটে বেড়াচ্ছে ফোঁস ফোঁস করতে করতে। এতে

---

৮৯. সূরা আ'রাফ, ৭ : ১১৪।

৯০. সূরা আ'রাফ, ৭ : ১১৫।

লোকজন ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। এটার স্পষ্ট উল্লেখ কুরআনে আছে—

فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾

"যখন তারা নিক্ষেপ করলো, তখন সাথে সাথে লোকজনের চোখ জাদুগ্রস্ত হয়ে গেলো। (এতে লোকজন) ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। তারা দেখালো এক সাংঘাতিক জাদু।"[৯১]

জাদুকরদের জাদু-প্রদর্শন পর্ব শেষ হলে মূসা আলাইহিস সালামের পালা এলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে বললেন হাতে থাকা লাঠিটাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলতে। আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তিনি তা-ই করলেন। সাথে সাথে সেটা আগের ন্যায় এক বিশালকার অজগর সাপে পরিণত হলো এবং সেটা গিলে খেতে লাগলো জাদুকরদের ছুঁড়ে ফেলা লাঠিগুলো। মূসা আলাইহিস সালামের এই মু'জিযাকে ফিরআউন ও তার সভাসদেরা 'জাদু' বলে উড়িয়ে দিলেও, যারা সত্যিকারের জাদুকর তারা বুঝেছে যে, এটা আদতে কোনো জাদু নয়। এটা এক মহা-শক্তির প্রকাশ! এই শক্তির উৎসস্থল এমন এক সত্ত্বা, যাঁর শক্তির ওপরে আর কোনো শক্তি নেই। এটুকু বুঝতে জাদুকরদের একটুও বেগ পেতে হয়নি।

তারপর কী হলো, জানেন?

খানিক আগেও যে জাদুকরেরা ফিরআউনের প্রাসাদে ঢুকে নবি মূসা আলাইহিস সালামকে পরাজিত করতে পারলে কী পুরস্কার পাবে তা নিয়ে দর কষাকষি করছিলো, তারা এখন সত্যের সামনে সর্বোতভাবে আত্মসমর্পণ করলো। দীপ্ত কণ্ঠে তারা ঘোষণা করলো একত্ববাদের। শিরক আর কুফরের জীবন ছেড়ে তারা প্রবেশ করলো তাওহীদের সু-শীতল ছায়ায়। কুরআন ঘটনাটাকে এভাবে তুলে এনেছে :

وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾

"এবং জাদুকরেরা সিজদাহবনত হলো। তারা বললো, 'আমরা ঈমান আনলাম সৃষ্টিজগতের রবের প্রতি, যিনি মূসা ও হারূনেরও রব।"[৯২]

---

৯১. সূরা আ'রাফ, ৭ : ১১৬।

৯২. সূরা আ'রাফ, ৭ : ১২০-১২২।

জাদুকরদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি এই প্রশ্নাতীত আনুগত্য দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো ফিরআউন। সে বললো :

> آمَنتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾
>
> "কী! আমি তোমাদের অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা তাতে ঈমান আনলে? অবশ্যই এটা তোমাদের ষড়যন্ত্র, যা নগরে বসে তোমরা পাকিয়েছ; নগরবাসীদের এখান থেকে বের করে দেওয়ার জন্য। এর পরিণাম শিগগির তোমরা টের পাবে। তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে আমি টুকরো টুকরো করে ফেলবো; তারপর তোমাদের সকলকে শূলে চড়াবো।"[৯৩]

ফিরআউনের এমন হুমকিতে একটুও ঘাবড়ালো না জাদুকরেরা। যাদের অন্তর ঈমানের সুধা পেয়ে গেছে, যেখানে তৈরি হয়ে গেছে বিশ্বাসের প্রাচীর, জালিমের হুমকি সেখানে আর কী চিড় ধরাবে? তারা খুব প্রশান্তভাবে বললো :

> إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا ۚ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾
>
> "নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের কাছেই ফিরে যাবো। আমাদের রবের নিদর্শন আমাদের সামনে প্রতিভাত হওয়ার পর আমরা তাতে ঈমান এনেছি বলেই কি তুমি আমাদের শাস্তি দিচ্ছ? হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের ধৈর্য ধারণের শক্তি দিন আর আমাদেরকে মৃত্যু দিন মুসলিম হিশেবে।"[৯৪]

---

৯৩. সূরা আ'রাফ, ৭ : ১২৩-১২৪।

৯৪. সূরা আ'রাফ, ৭ : ১২৫-১২৬।

২

ফিরআউনের সভাসদে আসা এই জাদুকরের দল আমাকে বিমুগ্ধ করে। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি—খানিক আগেই যারা দুনিয়া গোছাতে ব্যস্ত ছিলো, দুনিয়া লাভের দর কষাকষিতে মগ্ন ছিলো যারা, মুহূর্তের ব্যবধানে কী অলৌকিকভাবে তাদের ভাবনা জগতে আমূল পরিবর্তন চলে এলো! আসলে হিদায়াত খুব আশ্চর্য জিনিস। হিদায়াত কপালে থাকায় পারস্য দেশ থেকে সালমান আল-ফারিসি রাদিয়াল্লাহু আনহু কতো কাঠখড় পুড়িয়ে মদিনায় চলে আসলেন, কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একেবারে ঘরের মানুষ হয়েও আবূ লাহাবের কপালে হিদায়াত জুটলো না।

সেই জাদুকরদের জীবনের তিনটে দিক আমাদের জীবনের সাথে খুব প্রাসঙ্গিক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিদর্শন তাদের সামনে স্পষ্ট হওয়ার পরে তারা একটা মুহূর্তও বিলম্ব করেনি আত্মসমর্পণে। তারা চিন্তা করেনি মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গী হলে তাদের কপালে কী জুটবে। বরং নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও তারা গ্রহণ করেছিলো সত্যের অমোঘ বাণী। তারা পান করেছিলো ঈমানের অমৃত সুধা।

যাপিত জীবনে আমাদের সামনে যখন হারাম আর হালালের সীমারেখা স্পষ্ট হয়, আমরা কি ফিরআউনের সভাসদের সেই জাদুকরদের মতো হারাম ত্যাগ করে হালালকে গ্রহণ করতে পারি? উপার্জন হারাম হচ্ছে জেনেও আমরা কি ফিরে আসতে পারি সেই রাস্তা থেকে? যে হারাম আমরা উপার্জন করি, যে হারাম খাবার আমরা খাই, যে হারাম পথে আমরা চলি—যখন কেউ আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দেয় যে এগুলো হারাম, তখন কি আমরা ঘৃণাভরে তা ছুঁড়ে ফেলতে পারি? সেই জাদুকরেরা যেভাবে সিজদাহবনত হয়েছিলো আল্লাহর কাছে, আমরা কি সেভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারি আল্লাহর কাছে? নাকি আমাদের ঝুলিতে বিদ্যমান থাকে হাজারো যুক্তি, ভয় আর আশঙ্কা?

মূসা আলাইহিস সালামের একটা মু'জিযাতেই জাদুকরেরা ঈমানের তেজে বলীয়ান হয়ে উঠেছিলো, আর আমাদের সামনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নাযিলকৃত সবচেয়ে বড় মু'জিযা 'আল-কুরআন' বিদ্যমান, আমাদের

সামনে সর্বশ্রেষ্ঠ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাচার, আমাদের সম্মুখে সালিহীন, সাহাবা-সহ আল্লাহর মুত্তাকী বান্দাদের জীবনের দর্শন মজুদ আছে, তবুও আমরা সত্যের পথে ঝুঁকতে হাজারো দ্বিধা আর দ্বন্দ্বে পতিত হই। তবুও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিধানকে জীবনে বরণ করতে আমরা হাজির করি হাজারো 'যদি-তবে-কিন্তু!'

জাদুকরের জীবনের দ্বিতীয় যে দিক আমাকে ভাবায় তা হলো—জীবনের একটা সুন্দর সমাপ্তি। যাদের গোটা জীবন কেটেছে আল্লাহর অবাধ্যতায়, শিরক আর কুফরের মাঝে, জীবনের অন্তিম মুহূর্তটায় তারা পেয়ে গেলো শাহাদাতের মৃত্যু!

তাদের এই পরিণতি আমাকে জানিয়ে যায় যে—কখনোই আল্লাহর দয়া আর রহমত থেকে নিরাশ হতে নেই। শুরুটা যতো অসুন্দর আর কদর্যই হোক, সত্যের সামনে বিনীত আত্মসমর্পণের সৎ সাহস যদি অন্তরে থাকে, শেষ মুহূর্তে হলেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাতে হিদায়াতের নূর ঢেলে দেবেন।

আর তাদের জীবনের তৃতীয় যে দিক আমার নজর কাড়ে সেটা হলো—মূসা আলাইহিস সালামের কাছে তাদের পরাজয়। সেদিন পরাজয়ের স্বাদ না পেলে তারা সত্যের কাছাকাছি আসতে পারতো না। তারা মূসা আলাইহিস সালামের কাছে পরাজিত হয়েছিলো, কিন্তু জিতে নিয়েছিলো সবচেয়ে সেরা পুরস্কারটাই—জান্নাত।

যে পরাজয় আপনাকে আল্লাহর কাছাকাছি আনে, যে বিপদ আপনার সামনে উন্মুক্ত করে দেয় সত্যের পথ, মনে রাখবেন—সেটা কখনোই পরাজয় নয়। পরাজয়ের আবরণে সেটা আল্লাহর দয়া আর রহমত। এমন পরাজয়ের জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুলবেন না।

তারা কভু পথ ভুলে যায় না

১

কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা ব্যবসা দাঁড় করানোর ব্যাপারে মনস্থির করলাম একবার। কীসের ব্যবসা করবো, কীভাবে করবো সেসবের একটা খসড়াও আমাদের সামনে ছিলো। বন্ধুদের তিনজন নোয়াখালীর, একজন পাবনার, অন্যজন আমি। সঙ্গত কারণেই সবাইকে নিয়ে শুরুর দিকে একসাথে বসে দিনের পর দিন ব্যবসায়িক মিটিং করা সম্ভবপর ছিলো না। কারণ একেকজনকে একেক জায়গা থেকে আসতে হবে। ঢাকার বাইরে যারা আছে তাদের ঢাকা আসা এবং লম্বা সময় থাকা খানিকটা অসুবিধের বটে। তাছাড়া কেউ কেউ তখনো চাকরিরত, আর কারও-বা আলাদা ব্যবসা আছে। সেসবকিছুতে ইস্তফা দিয়ে ঢাকা এসে রাত-দিন এক করে নতুন ব্যবসার জন্য সময় বের করা কিছুটা কঠিন ছিলো।

আমরা ঠিক করলাম কোনো এক শুক্রবারে আমরা মিটিংটা সারবো। আমাদেরই একজনের বাসায় এবং আলোচনা চলবে সারা দিনমান! সেই হিশেবেই এক শুক্রবারে আমরা বসলাম এক বন্ধুর বাসাতে।

নানান পলিসি, ব্যবসায়িক পদ্ধতি, ব্যবসায়ের ধরন ইত্যাদি নিয়ে নানান আলাপ-আলোচনা চললো সারাদিন। যখন আলোচনা শেষ করতে যাবো, আমাদের এক বন্ধু বললো, 'তাহলে অফিশিয়ালি আমরা ঠিক কবে শুরু করছি?'

কেউ বললো 'অমুক' দিন থেকে, কেউ বললো 'অমুক' তারিখ' থেকে। সবাই যার যার পছন্দসই দিন, সপ্তাহ আর মাসের কথা বলতে লাগলো যে, কোন দিন থেকে আমাদের ব্যবসায়িক যাত্রাটা শুরু করা যায়। কিন্তু আমাদের মধ্যকার

একবন্ধু বেশ বেঁকে বসলেন সেদিন। তিনি বললেন, 'দেখুন, আমরা ব্যবসা করার জন্য রাজি হয়েছি এটা ঠিক। আজকের মিটিংয়ে আমরা সেই ব্যবসা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছি, প্রজেক্ট প্রোফাইল দেখেছি, ব্যবসাটার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎও যাচাই-বাছাই করার হালকা সুযোগ পেয়েছি। তবে—এই এক বসাতেই ব্যবসাটা কখন শুরু করবো সে ব্যাপারে চূড়ান্ত মতামতে চলে আসাটা আমার কাছে উচিত কাজ বলে মনে হচ্ছে না। আমার মতে—আমরা আরেকটু সময় নিতে পারি। সবকিছু আরেকবার পুনর্বিবেচনা করতে পারি এবং সবচেয়ে বড় কাজ যেটা সেটা হচ্ছে—ইস্তিখারার সালাত পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে পারি এই সিদ্ধান্তটার ব্যাপারে। এসবকিছুর জন্য আমার মনে হয় আরও কয়েকদিন সময় নিলে সকলের জন্য উত্তম হবে, ইন শা আল্লাহ।'

তাঁর কথায় সায় দিলাম। ঠিক করলাম আমরা কাজগুলোর জন্য কিছুদিন সময় নেবো। একটা দিনক্ষণ ঠিক করলাম যেদিন আমরা আমাদের সিদ্ধান্তটা জানাতে পারবো।

আমরা ইস্তিখারা করেছি। ইস্তিখারা করে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে—আরেকটু সময় নিয়ে ব্যবসাটা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাওয়া উচিত। একসাথে শুরু করবো, অনেকগুলো টাকা এতে বিনিয়োগ হবে, অনেকে নিজ নিজ চাকরি এবং ব্যবসা ছেড়ে এখানে চলে আসবে। এতো আয়োজন যেখানে শুরু হবে, সেই ব্যবসাটাকে নিয়ে আরেকটু চিন্তা করাটা দরকার বৈকি!

আমরা আলাপ চালিয়ে গেলাম এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো যে—ব্যবসাটা আমরা করবো না। ব্যবসাতে না আগানোর পেছনে বেশ অনেকগুলো কারণ উঠে এসেছে আমাদের সামনে তখন এবং কারণগুলো যে অবশ্যই যৌক্তিক সেটা আমরা সকলেই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি।

ব্যবসাটা কিন্তু আমরা শুরুই করে দিচ্ছিলাম প্রায়! আমাদের কাগজপত্র গোছানোর কথাও উঠে এসেছিলো প্রথম বৈঠকে। কেবল একজন মানুষের কথায় আমাদের সংবিৎ ফিরলো এবং এ-ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য তালাশের ব্যাপারে আমরা আরেকটু সময় নিয়েছিলাম। দিনশেষে সেই ব্যবসাতে আমাদের একসাথে আগানো হয়নি এবং আমরা বিশ্বাস করি—এই আগাতে না পারার মধ্যেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাহায্য ছিলো। এর মধ্যেই ছিলো

আমাদের জন্য কল্যাণ।

সেই বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞ হলাম যিনি উক্ত বৈঠকে আমাদেরকে আল্লাহর সাহায্য তালাশের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রশ্নের পাথরে বিক্ষত করলাম নিজেকে—জীবনের এতো বড় একটা সিদ্ধান্তে আল্লাহর সাহায্য তালাশের কথা বেমালুম ভুলে গেলাম কীভাবে?

২

আমরা সকলে নবি ইউনুস আলাইহিস সালামের মাছের পেটে বন্দী থাকার ঘটনাটা জানি; কিন্তু ঠিক কী কারণে তাঁকে বরণ করতে হয়েছিলো এমন ভয়ানক বন্দীত্ব তা কি আমরা জানি?

নবি ইউনুস আলাইহিস সালামকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুসেলের একটা জনপদে নবি হিশেবে প্রেরণ করেছিলেন। জনপদের লোকদেরকে তিনি আল্লাহর একত্ববাদ গ্রহণ করতে এবং যাবতীয় শির্ক থেকে বেঁচে থাকার আহ্বান জানান। কিন্তু মুসেলের ওই জনপদের অধিবাসীরা কর্ণপাত করে না ইউনুস আলাইহিস সালামের আহ্বানে। তারা তাদের পূর্বেকার রীতি-নীতি এবং শির্ক আর কুফরে বিভোর থাকে। এভাবে বহু বছর ধরে তাওহীদের বার্তা বিলাতে থাকেন নবি ইউনুস আলাইহিস সালাম, কিন্তু কোনো পরিবর্তনই তিনি জনপদের লোকেদের মাঝে দেখতে পান না।

একটা সময় জনপদের লোকেদের ওপরে ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন ইউনুস আলাইহিস সালাম এবং তাদেরকে বলেন—'যেহেতু তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তোমাদের মনগড়া ধর্মের মাঝে অটল আছো, আজ আমি তোমাদের ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি এবং এ-ও বলে যাচ্ছি—তোমাদের ওপর শীঘ্রই আল্লাহর আযাব নেমে আসবে।'

ইউনুস আলাইহিস সালাম জনপদ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর জনপদে আল্লাহর আযাবের কতিপয় নিদর্শনাবলিও স্পষ্ট হয়। এতে বেশ ঘাবড়ে যায় জনপদবাসী। তারা বাড়ি-ঘর ছেড়ে দলবেঁধে জঙ্গলের দিকে চলে যায় এবং অবিরত কান্নাকাটির

মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে তাওবা করতে থাকে নিজেদের ভুলত্রুটির জন্য।

তাদের এই আন্তরিক তাওবা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কবুল করেন এবং তিনি জনপদবাসীকে উক্ত আযাব থেকে মুক্তি দেন।

এদিকে ইউনুস আলাইহিস সালামের ধারণা ছিলো যে—আল্লাহর আযাব আসবেই আসবে এবং জনপদবাসীও এতে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু যখন শুনতে পেলেন আল্লাহর আযাব আসেনি, তখন তিনি বেশ চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভাবলেন—যদি আমি তাদের মাঝে ফিরে যাই, নির্ঘাত তারা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে।

তাফসীরে এ-ও আছে, ইউনুস আলাইহিস সালামের জনপদে একটা রীতি প্রচলিত ছিলো যে—তাদের মাঝে কেউ যদি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়, তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলা হতো। আল্লাহর আযাব না আসাতে ইউনুস আলাইহিস সালাম ভাবলেন—ফিরে গেলে তার প্রাণ নাশেরও আশঙ্কা আছে বৈকি।

এমন ভাবনা থেকে তিনি মুসেলে, অর্থাৎ নিজের জনপদে ফিরে না গিয়ে অন্যত্র হিজরত করা শুরু করলেন। পথিমধ্যে একটা নদী পড়লো। অনেকের সাথে তিনিও একটা নৌকায় উঠে বসে পড়লেন নদী পার হওয়ার জন্য।

তাদেরকে নিয়ে নৌকা যখন মাঝ দরিয়ায় পৌঁছালো, তখন কোনো এক কারণে নৌকা আটকে গিয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। ডুবে যাওয়া থেকে নৌকাকে বাঁচাতে হলে কী করতে হবে? মাঝিরা বললো—নৌকায় থাকা কোনো এক ব্যক্তিকে নদীতে ফেলে দিলেই নৌকা হালকা হবে এবং নৌকা মুক্ত হবে। কিন্তু কাকে ফেলা যায় নদীতে?

একটা লটারি করা হলো এবং সেখানে উঠে এলো নবি ইউনুস আলাইহিস সালামের নাম!

নিজের নাম উঠে আসায় নবি ইউনুস আলাইহিস সালাম নিজ থেকে দরিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নির্দেশে এক বৃহৎ আকৃতির মাছ এসে গলাধঃকরণ করে ফেললো তাঁকে।

এর পরের ঘটনা তো আমাদের সকলের-ই জানা। ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহর দরবারে আকুল ফরিয়াদে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং সেই সু-বিখ্যাত—لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ (লা ইলাহা ইল্লা আংতা সুবহানাকা ইন্নী কুংতু মিনায-যলিমীন) দুআর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নিজের ভুল স্বীকার করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে তাঁর ফরিয়াদ পছন্দ হয় এবং তিনি নবি ইউনুস আলাইহিস সালামকে মাছের পেটের ভেতর থেকে উদ্ধার করেন।[৯৫]

এই পুরো ঘটনাটি কেন ঘটেছে বলতে পারেন? কারণ—আল্লাহর আদেশ ব্যতীতই ইউনুস আলাইহিস সালাম তাঁর সম্প্রদায়কে ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছিলেন। আল্লাহর আদেশের জন্য তিনি অপেক্ষা করেননি। কিন্তু তাঁর এই কাজ পছন্দ করেননি আরশের অধিপতি। তিনি নাখোশ হয়েছেন। আল্লাহর সিদ্ধান্তের বাইরে গেলে, আল্লাহর আদেশের অপেক্ষা না করে নিজের মর্জি মোতাবেক চলতে গেলে কী ভীষণ বিপদের মুখোমুখি হতে হয়—তার একটা নমুনা তিনি ইউনুস আলাইহিস সালামকে দেখিয়েছেন। দরিয়ার গভীর অন্ধকার তলায়, মাছের পেটের ভেতরকার ঘাঢ় ঘন অন্ধকারে ইউনুস আলাইহিস সালামকে সাময়িক সময়ের জন্য রেখে মহান রব এই বার্তা দিলেন যে—আল্লাহর সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করাই কল্যাণের। কেউ যদি তাঁর সিদ্ধান্তের বাইরে চলতে চায়, কেউ যদি তাঁর আদেশকে অগ্রাহ্য করতে চায়, সে যেদিকেই মুখ ফিরাক না কেন, তার সেই পথ হবে বিপদসংকুল।

৩

জীবনের চলতিপথে আমাদেরকে নানান ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত, সামাজিক সিদ্ধান্ত, পারিবারিক সিদ্ধান্ত কিংবা একান্ত ব্যক্তিগত। এই সিদ্ধান্তগুলো নেওয়ার সময় আমরা প্রাধান্য দিই আমাদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনাকে। আমাদের বুদ্ধি আর বিবেচনাবোধকে কাজে লাগিয়ে আমরা লেগে পড়ি যেকোনো কাজে। দরকারে—আমরা দ্বারস্থ হই উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞদেরও।

---

৯৫. বিস্তারিত দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ১৬/৩৭৮-৩৮০; ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৫/৩৬৬-৩৬৭; সুহাইলি, আত-তাফসীরুল মুনীর, ১৭/১১৬-১১৭।

কিন্তু সিদ্ধান্তগুলোতে যাওয়ার আগে আল্লাহর কাছে কল্যাণ চাওয়া, তাঁর সাহায্য চাওয়ার কথা আমাদের খুব কম-ই স্মরণে থাকে।

কেউ বলতে পারেন, আল্লাহর কাছে কীভাবে আমরা সিদ্ধান্ত চাইবো? কীভাবে বুঝবো যে কোনটা তাঁর সিদ্ধান্ত আর কোনটা নয়?

আল্লাহর সিদ্ধান্ত অবশ্যই আমরা ওহির দ্বারা লাভ করবো না। আমরা যা করতে পারি তা হলো—আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা যে সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই না কেন, চূড়ান্ত পর্বে ঢুকে যাওয়ার আগে আমরা দুই রাক'আত সালাত আদায় করে নেবো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে বলবো, 'আমার রব, আমাকে যে বুদ্ধি এবং বিবেচনাবোধ আপনি দিয়েছেন, তা কাজে লাগিয়ে আমার মনে হলো অমুক কাজটাই আমার জন্য কল্যাণের হবে। কিন্তু অদৃশ্যের জ্ঞান তো একমাত্র আপনার নিকটেই। আপনিই জানেন এই কাজে আদৌ আমার জন্য কোনো কল্যাণ আছে কি নেই। আপনার কাছে আমার আকুল ফরিয়াদ—আমি যে সিদ্ধান্তটা নিতে যাচ্ছি তাতে যদি কোনো অকল্যাণ থাকে, তাহলে আপনি তা দূর করে দিন। যদি তা না হয়, সেই অকল্যাণ আমাকে গ্রাস করার আগে সেখান থেকে আমাকে আপনি নিরাপদে ফিরে আসার তাওফীক দিন।'

সিদ্ধান্তসমূহ নেওয়ার আগে কিংবা নেওয়ার পর আমরা যদি ইস্তিখারার সালাত পড়ে আল্লাহর কাছে এভাবে চাইতে পারি, তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সিদ্ধান্তগুলোকে কল্যাণকর করে দেবেন। কোনো অকল্যাণ থাকলে তা দূর করে দেবেন। অথবা—সেই অকল্যাণের দ্বারা আমাদের বড় কোনো ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আগেই তিনি আমাদের তা থেকে বাঁচিয়ে নেবেন।

একটা ইসলামি সংগীতের কথার মধ্যে আছে—'যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয়, তারা কভু পথ ভুলে যায় না।' জীবনের চলতিপথে যে আল্লাহকে ভয় করে এবং যে সঙ্গী বানায় তার রবকে, সে কি পথ ভুল করতে পারে?

ভীষণ একলা দিনে

১

দিন কয়েক আগের ঘটনা। আমার বাসার পাশের হাসপাতালের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। হাসপাতাল এলাকা সাধারণত খুবই লোকারণ্য থাকে—রোগী, ডাক্তার, অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদিতে। এমনসব জায়গায় হইচই-হট্টগোল লেগে থাকা খুব স্বাভাবিক।

কিন্তু সেদিন হাসপাতাল গেইটের বাইরে একজন মহিলাকে দেখলাম কী ভীষণ আর্তচিৎকারের সাথে কান্না করছে। বুক চাপড়ে কান্না যাকে বলে! বুঝতে বাকি রইলো না যে নিশ্চিত কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে। হয়তো কাছের কেউ মারা গেছে, নতুবা গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

আগ্রহ আটকে না রাখতে পেরে পাশের একজনকে জিগ্যেশ করলাম, 'কী হয়েছে, ভাই?' তিনি বললেন, 'মহিলার বাচ্চা হারিয়ে গেছে।'

একটা ধাক্কা খেলাম যেন! কোনো একটা বিপদ মাথায় নিয়ে হয়তো হাসপাতালে এসেছিলেন তিনি। এসেই হারিয়ে ফেলেছেন নিজের বাচ্চাকে। বিপদের ওপর বিপদ যাকে বলা যায়! পর্দাবৃত মহিলা এতো জোরে কান্না করছেন যে, আশপাশের সমস্ত লোক এসে জড়ো হয়ে গেছে ওই জায়গায়। দেখতে দেখতে মহিলা মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়া শুরু করলেন। গগনবিদারী চিৎকারে তিনি বলছেন, 'বাপ, ও বাপ। ও সোনা কোথায় তুই? আল্লাহ আমি আমার সোনা বাপরে কই পাবো! ও আল্লাহ!'

আমি নিজে যেহেতু একজন বাবা, তাই সন্তানের জন্য একজন মায়ের এমন আহাজারি দেখে বুকের ভেতরটা বিষাদে কেমন যেন ছেয়ে গেলো। মনে মনে আল্লাহকে বললাম, মহিলার বুকের ধনকে যেন তিনি সযত্নে মায়ের কাছে

ফিরিয়ে দেন।

আমার কিছু মেহমানকে স্টেশান পর্যন্ত রেখে আসার জন্যই বের হয়েছিলাম সেদিন। কিন্তু এমন মর্মান্তিক ঘটনাটা দেখে খানিকটা বিমূঢ়-ই হয়ে পড়েছি! সাথের মেহমানদের জানাতে তারাও ভীষণ দুঃখ পেলো।

ঘটনাস্থল ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিলো না কোনোভাবে। আমার মন বলছিলো বাচ্চাটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। সন্তান হারিয়ে তার বুক-ভাঙা কান্নার দৃশ্য তো দেখলাম, সন্তানকে ফিরে পাওয়ার পর কী অবস্থা হবে তার, সেটা দেখে যেতে খুব ইচ্ছে করছিলো। চারপাশও কেমন স্থবির হয়ে পড়েছে এই ঘটনায়। সবাই ভিড় করে আছে একটা জায়গায়। কেউ কেউ আশপাশে খোঁজ লাগাচ্ছে। কেউ এদিক-সেদিক ফোন দিচ্ছে।

একটু বাদেই জটলার ভেতর থেকে রব উঠলো, 'পাওয়া গেছে রে পাওয়া গেছে। বাচ্চাটাকে পাওয়া গেছে।'

এই আওয়াজটুকু শুনে কী অদ্ভুত আনন্দে আমার মনটা নেচে উঠেছে, তা ভাষায় বোঝানো সম্ভব নয়। আমি দৌড়ে গিয়ে দেখি একটা বাচ্চাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে আসছে এক লোক। যে-ই না বাচ্চাটাকে তার মা'র কাছে দিলো, অমনি মহিলাটা বাচ্চাকে দুই হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো বুকে। এবং তারপর— ধপাস করে মহিলা মাটিতে পড়ে গেলো!

পাশের একজন মহিলা বলে উঠলেন, 'বেঁহুশ হয়ে গেছে। পানি আনো পানি আনো।' অন্য আরেকজন বললেন, 'আহারে! একেই বুঝি বলে মা!'

নানান জনের মুখ থেকে নানান কথা বেরিয়ে আসছে তখন। পাশে বাচ্চাটা অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সব। আমি আর বেশিক্ষণ দাঁড়ালাম না। এক অন্যরকম ভালো লাগা নিয়ে আমি ছেড়ে এলাম জায়গাটা।

২

জীবনের নানান বাঁক বদলে এই ঘটনা আমি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। সেদিন সূরা আল-মা'আরিজ পড়তে গিয়ে পুনরায় মনে পড়লো সেটা। সূরা মা'আরিজের

বর্ণনা এবং সেদিনকার সেই দৃশ্যপট—দুটো ঘটনাকে পাশাপাশি রেখে যখন ভাবতে গেলাম, ভয় আর আতঙ্কে আমার রক্ত যেন হিম হয়ে গেলো।

সূরা আল-মা'আরিজের শুরুর দিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ অবস্থা কীরকম হবে, তার খানিকটা বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ۝٨ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝٩

"সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মতো।
আর পাহাড়গুলো হবে রঙিন পশমের মতো।"[৯৬]

কিয়ামতের ঠিক প্রাক্কালে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুনিয়াকে ধ্বংস করে দেবেন। এই ধ্বংসযজ্ঞ কতোটা ভীতিকর, কতোটা বীভৎস হবে তা অনুমান করার জন্য বোধকরি এই দুটো আয়াতই যথেষ্ট। বলা হচ্ছে—সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মতো। অর্থাৎ—ধাতুকে গলানো হলে তা যেভাবে তরলে পরিণত হয়, আকাশ ঠিক সেরকম এক গলিত তরলে পরিণত হবে। আকাশকে ধ্বংস করা হবে এভাবেই। বৃষ্টির মতো সেই গলিত তরলে প্লাবিত হবে গোটা দুনিয়া।

পরের আয়াতে বলা হচ্ছে—পাহাড়গুলো হবে রঙিন পশমের মতো।

আমি ভাবলাম—এখানে পাহাড়গুলোকে জমিনের নিচে ধসিয়ে দেওয়ার কথা বলা হলো না কেন? বা পাহাড়গুলোকে ধুলোয় পরিণত করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার কথাও তো বলা যেতো, কিন্তু সেসবের দিকে না গিয়ে, কুরআন পাহাড়গুলোকে রঙিন পশমের মতো করে ধ্বংস করার কথাই বা কেন বললো?

আমার ধারণা—ধ্বংসকালীন অবস্থাটা কতোটা বীভৎস আর ভয়ংকর রূপ নেবে তা বোঝাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এরকম রূপকের ব্যবহার করেছেন। আকাশ হচ্ছে ওপরের বস্তু। ওপরের সেই বস্তুকে তিনি গলিয়ে মাটিতে নামিয়ে আনবেন। আর পাহাড় হলো মাটির বস্তু। মাটির সেই বস্তুর অবস্থা তিনি এমন করে ছাড়বেন যে—সেটা আকাশে ভেসে বেড়াতে শুরু করবে। মোদ্দাকথা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগে আগে জগতে কী নিদারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে

---

৯৬. সূরা মা'আরিজ, ৭০ : ৮-৯।

ওই সময়ে তা, বোঝাতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আকাশকে গলিত ধাতু বানিয়ে জমিনে নামিয়ে আনা, এবং পাহাড়কে রঙিন পশম বানিয়ে হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। কী দুর্যোগ আর দুর্ভোগময় হবে সে পরিস্থিতি!

আকাশ এবং পাহাড়ের দুটো ভয়ংকর অবস্থা বর্ণনা করার ঠিক পরের আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই মহা বিপর্যয়ের সময়টাতে মানুষদের অবস্থা কতো করুণ হবে, তা মেলে ধরলেন :

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۝١٠ يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ۝١١

"সেদিন সুহৃদ খবর নেবে না সুহৃদের। যদিও তাদেরকে রাখা হবে পরস্পরের দৃষ্টির সম্মুখেই; অপরাধী সেদিনের আযাব থেকে বাঁচার জন্য বিনিময় হিশেবে দিতে চাইবে তার সন্তানকে।"[৯৭]

আয়াতের এই জায়গায় এসে আমি একেবারে 'থ' হয়ে গেলাম! একবার মনে হলো—ভুল পড়লাম না তো? কিন্তু না, আমি ভুল কিছু পড়িনি। সেদিনের অবস্থা এতো করুণ, পরিস্থিতি এতো নাজুক হবে, যা বর্ণনার ঊর্ধ্বে। ভয় আর আতঙ্কে মানুষ এতোটাই বিহ্বল থাকবে যে—এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে, আসন্ন দুর্যোগ আর দুর্ভোগ থেকে নিজেকে বাঁচাতে মা তার কোলের সন্তানকে সাধবে! বলবে, 'নাও নাও! এ আমার সন্তান ছিলো দুনিয়ায়। আমি ওকে নয় মাস গর্ভে ধারণ করেছি। বড় আদর-যত্ন করে ওকে বড় করেছি। ওকে আমি তোমাদের হাতে তুলে দিতে চাই। ওকে যা করার করো—তার বদলে তোমরা আমাকে মুক্তি দাও।

আমি চিন্তা করলাম হাসপাতালের গেইটে সেদিন দেখা সেই মায়ের কথা। সন্তানকে হারিয়ে আকাশ-বাতাস এক করে আহাজারি করা সেই মা, সন্তানকে ফিরে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরতেই যিনি সেদিন মূর্ছা গিয়েছিলেন—সেই মা কিয়ামতের এমন ভয়াবহ দুর্যোগের মুহূর্তে তার ওই সন্তানকে বিনিময় হিশেবে দিয়ে নিজে বেঁচে যেতে চাইবে! ভাবা যায় ঠিক কতোখানি বিপদসংকুল হবে সময়টুকু? অবস্থার ভয়াবহতা কতোটা প্রকট হলে পিতা-মাতা নিজেদের

৯৭. সূরা মা'আরিজ, ৭০ : ১০-১১।

সন্তানকে বিনিময় হিশেবে দিয়ে বাঁচতে চাইবে জাহান্নামের লেলিহান আগুনের শিখা থেকে?

আমাদের মায়েরা—আমরা না খেলে যারা খেতে পারেন না, আমরা ঘরে না এলে যারা ঘুমাতে পারেন না, আমাদের অসুখ হলে যাদের সারাটা রাত নির্ঘুম কেটে যায়। আমাদের বাবারা—যারা সারাটা জীবন সংগ্রাম করে আমাদের ভালো থাকার জন্য, যাদের কোল আর কাঁধ আমাদের সারাজীবনের আশ্রয় এবং প্রশ্রয়—সেই মা এবং বাবা কিয়ামতের মাঠে চাইবে আমাকে জাহান্নামে ঠেলে দিয়ে হলেও যেন তারা বেঁচে যেতে পারে!

৩

আমাদের পিতা-মাতারাই যেখানে আমাদের চিনতে চাইবেন না সেদিন, আমাদের বিনিময় হিশেবে দিয়ে নিজেরাই যখন বাঁচতে চাইবেন জাহান্নামের আগুন থেকে, সেখানে দুনিয়ার কোনো সঙ্গী-সাথি, বন্ধু-সুহৃদ আর শুভাকাঙ্ক্ষী কাজে আসবে আমাদের, বলুন? দুনিয়ার সকল সুহৃদ-শুভাকাঙ্ক্ষী, যাদের একনজর না দেখতে পেলে ব্যাকুল হয়ে উঠতাম আমরা, যাদের মন রক্ষার জন্য আমরা জেগেছি অযুত রাত্রি, যাদের আমরা ধরে নিয়েছিলাম বাঁচা আর মরার সাথি হিশেবে, সেই মহা দিবসে আমরা সবিস্ময়ে দেখবো—কেউ আসলে কারও নয়।

মহাপ্রলয়ের সেই সংকটময় সময়ে আমরা প্রত্যেকে একলা হয়ে যাবো। দূর আকাশে মিটিমিটি জ্বলা সেই সঙ্গিহীন তারাটার মতো, প্রকৃতির বুকে ঝুপ করে নেমে আসা সেই নিঃসীম অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতের মতো।

তবে, আখেরে সু-সংবাদ তাদের জন্য; যারা জীবনকে ঠিক সেভাবে সাজিয়েছে, যেভাবে সাজানো গেলে পৌঁছানো যায় কাঙ্ক্ষিত মঞ্জিলে। যারা দুনিয়ায় সময় সওদা করে কিনে নিয়েছে আখিরাতের পাথেয়। পাপাচার আর অনাচারের চোরাগলিতে যারা ডুবে যায়নি, যারা শেষপর্যন্ত মরে যেতে দেয়নি তাদের হৃদয়গুলোকে, যাদের অন্তরে ঠাঁই করে নিয়েছিলো হেরার রশ্মি—বিজয়মাল্য তাদের জন্যই। সেই মহা বিপর্যয়ের দিনে মহামহিম রবের আরশের ছায়াতলে তারা জায়গা করে নেবে।

একটা জীবন যদি কুরআনের রঙে সাজানো যায়, যদি জীবনের সকল অনুষঙ্গের উপাদান উঠে আসে কুরআনের পাতা থেকে–কেমন হবে? কেমন হবে যদি কুরআন সেই অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো হয়ে ওঠে, দুঃখের দিনে যে কাঁধে হাত রেখে বলে–ভয় পেয়ো না, সাথে আছি?

কুরআন কীভাবে আমাদের জীবনে আলো ছড়ায়, কীভাবে তার মণি-মুক্তোর আকর থেকে আমরা কুড়িয়ে আনবো জীবনের রসদ, তার বাতলে দেওয়া পথ থেকে কীভাবে গুছিয়ে নেবো অনন্ত জীবনের পাথেয়–জীবনের সেই অনুষঙ্গগুলোকে কুরআনের আয়নাতে তুলে ধরার একটা স্বপ্নময় প্রচেষ্টার নাম–কুরআন থেকে নেওয়া জীবনের পাঠ। পাঠক, আমাদের সেই স্বপ্নের দুনিয়ায় আপনাকে স্বাগতম...

সত্যায়ন
প্রকাশন